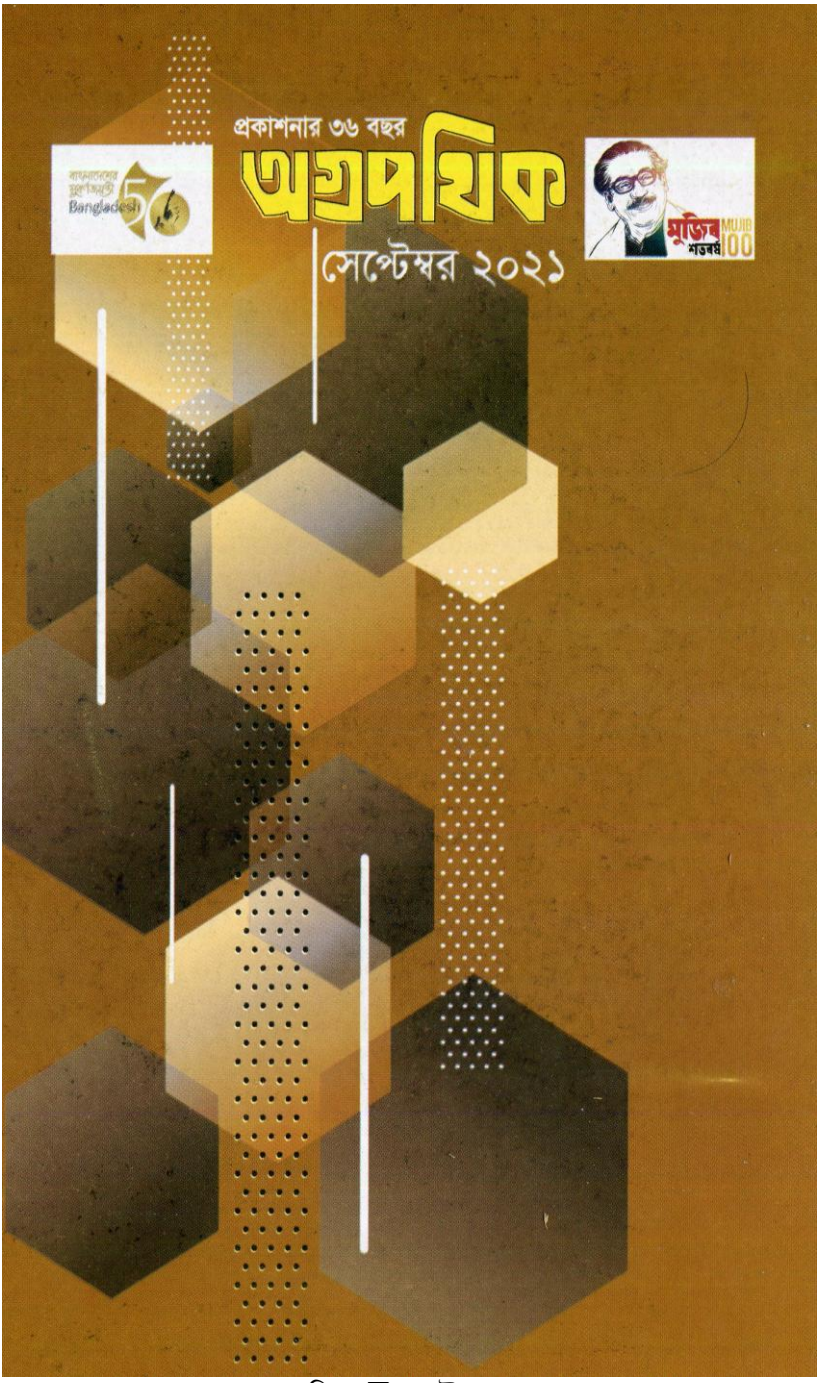

প্রকাশনার ৩৬ বছর
অগ্রপথিক
সেপ্টেম্বর ২০২১
Bangladesh
মুজিব শতবর্ষ
MUJIB 100

প্রকাশনার ৩৬ বছর

অগ্রপথিক

সৃ জ ন শী ল মা সি ক

ছত্রিশ বর্ষ ❑ সংখ্যা ০৯
সেপ্টেম্বর ২০২১ ॥ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৮ ॥ মুহাররম-সফর ১৪৪৩

প্রধান সম্পাদক
ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান

সম্পাদক
মোহাম্মদ আনোয়ার কবির

প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অগ্রপথিক

নিয়মাবলী

- অগ্রপথিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর সৃজনশীল মাসিক মুখপত্র।
- ইসলামের সুমহান জীবনাদর্শ প্রচার ও প্রসারে বিতর্কের উর্ধ্বে থেকে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, জীবনী, তথ্যমূলক ফিচারসহ সৃজনশীল লেখকদের গল্প, কবিতা, নাটক, স্মৃতিকথা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি,শিল্পকলা, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক লেখা প্রকাশ এবং মননশীল পাঠক তৈরি করা অগ্রপথিকের প্রধান উদ্দেশ্য। পাশাপাশি বিশ্ব মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।
- উদ্দেশ্যের অনুকূলে যে কেউ তাঁর নির্বাচিত মূল্যবান লেখাটি অগ্রপথিক-এ প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন, তবে অবশ্যই স্পষ্ট ও নির্ভুল হতে হবে। কাগজের দুই পৃষ্ঠায় গ্রহণযোগ্য নয়। অগ্রপথিক-এর ই- মেইল ঠিকানায়ও লেখা পাঠাতে পারেন। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না। প্রকাশিত লেখার সম্মানী দেয়া হয়। লেখা সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় বিক্রয় শাখা (বায়তুল মুকাররম, ঢাকা) সহ বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে অগ্রপথিকসহ অন্যান্য প্রকাশনা কিনতে পাওয়া যায়।

প্রচ্ছদ
ফারজীমা মিজান শরমীন

মূল্য : ২০ টাকা

যোগাযোগ
সম্পাদক
অগ্রপথিক
প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫১৯
E-mail : ifa.agropothik@gmail.com

সম্পাদকীয়

প্রকৃতিতে এই মাসে এসেছে নতুন ঋতু। বাংলা ঋতু অনুযায়ী এই মাসে শুরু হয়েছে শরৎকাল। আকাশে মেঘের খেলা, সাদা মেঘের উড়াউড়ি, কাশফুলে ভরা কাশবন-এর চিত্র আমাদের মনোজগতে আল্লাহর অপার মহিমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বর্ষার পরে শরৎকাল প্রকৃতি জগতে যে পরিবর্তন আনে তা সকলের মানসপটে ছাপ রাখে। বাংলার প্রকৃতিতে এখন ষড়ঋতুর দেখা পাওয়া অনেকাংশে স্বাপ্নিক ব্যাপার। ঋতুবৈচিত্র্য এখন শুধুমাত্র পাঠ্য বইয়ের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। প্রকৃতির প্রতি আমাদের নানা অবিচার অনিয়ম ঋতুবৈচিত্র্যকে অনেকাংশে নষ্ট করে দিয়েছে। প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার বিষয়ে আমাদের পবিত্র ইসলাম ধর্মে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। নানাবিধ দূষণ, নদী-খাল-বিল দখল, গাছ কাটা, অপরিকল্পিত শিল্প বর্জ্য নিঃসরণ, অপরিকল্পিত নগরায়ণ ধ্বংস করে দিচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশকে। বাংলার আবহাওয়া জলবায়ু তার চিরায়ত রূপকে হারাচ্ছে। আমরা যদি এখনো সতর্ক না হই, প্রকৃতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ না করি তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বংশধরদের কাছে কোন পৃথিবী রেখে যাবো? প্রকৃতি পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে মহান রব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআন শরীফে নানাভাবে সতর্ক করেছেন। মানবজাতিকে ভয়াবহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রতিটি মানুষকে তার জায়গা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। প্রতিটি মানুষ সতর্ক থেকে প্রকৃতি পরিবেশ রক্ষায় আন্তরিক হলে একটি জীব বৈচিত্র্যপূর্ণ সুস্থ সুন্দর প্রাকৃতিক পৃথিবী তৈরি হতে পারে। মহান

রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে একটি আদর্শ সুন্দর পৃথিবী তৈরি করার তৌফিক দান করুন।

শুভ জন্মদিন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু কন্যা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভ জন্মদিন ২৮ সেপ্টেম্বর। এবছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৭৫তম জন্মদিন। ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তিনি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। মহান রাব্বুল আলামিনের অশেষ রহমতে তিনি আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের কাণ্ডারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দেশ ও মানুষের কল্যাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। ২১ বার তাঁকে হত্যার অপচেষ্টা হয়েছে। মহান রাব্বুল আলামিনের কৃপায় তিনি রক্ষা পেয়েছেন এবং আজ তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। এখন আমরা উন্নত দেশের দিকে যাত্রা করছি। বিশ্ব সম্প্রদায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বকে বার বার শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছেন। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায় ১৯৭৫ সালে সপরিবারে জাতির পিতার হত্যাকাণ্ডের সময়ে বিদেশে থাকার জন্য বঙ্গবন্ধুর দু'কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বেঁচে যান। বঙ্গবন্ধুর দু'কন্যা আমাদের জাতির জন্য আশির্বাদ স্বরূপ। পুরাণের ফিনিক্স পাখির মতো ধ্বংসস্তূপ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর গতিশীল নেতৃত্বের মাধ্যমে এ জাতিকে বিশ্ব দরবারে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশের এমন কোন সেক্টর বাদ নেই যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বের ছোঁয়া লাগেনি। সকল সেক্টরের মতো ধর্মীয় সেক্টরেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উল্লেখযোগ্য দৃশ্যমান গুরুত্বপূর্ণ আবদান রাখছেন। সর্বশেষ ৫৬০টি মডেল মসজিদ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে মুসলিম বিশ্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এক অনন্য নজীর স্থাপন করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই শুভ ৭৫তম জন্মদিনে আমরা মহান রাব্বুল আলামিনের কাছে তাঁর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘ হায়াতের জন্য মুনাজাত জানাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর একটি বিশেষ লেখা আমরা এই সংখ্যায় প্রকাশ করছি। লেখাটি থেকে পাঠকেরা অনেক মূল্যবান বিষয় জানতে পারবেন।♦

সূচি

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

ইমাম
মুহাম্মদ মিযান বিন রমজান
ইমাম মালিক (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী♦০৯

শামস সাইদ
২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা : কলঙ্কিত ইতিহাস♦৯০

সুরক্ষা
ডা. এম এ মুমিত আজাদ
কোভিড-১৯ এবং ভ্যাকসিন♦১২৩

শুভ জন্মদিন
মোঃ ফরিদুল হক খান, এম.পি.
শুভ জন্মদিন : উন্নয়ন অভিযাত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা♦২৬
মিলন সব্যসাচী
বিশ্বের সফল নারী নেতৃত্বে শীর্ষবিন্দু স্পর্শী শেখ হাসিনা♦৩৩

মুজিববর্ষ
ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান/ মো. আশরাফুল ইসলাম
বঙ্গবন্ধুর কারাগারের রোজনামচায় ধর্মীয় চিন্তাধারা♦৪০

মহিয়সী বীর
কাজী আখতার উদ্দিন
দেশপ্রেমিক তিন বীর তুর্কি নারীর বীরত্বগাঁথা♦৭৮

কবিতা

শামসুল ফয়েজ
উন্নয়নের অপরূপ দিশারী♦৯৬
হাসান হাফিজ
রক্ত নয়, বিপথগামিতা নয়♦৯৭
আ ফ ম ইয়াহিয়া চৌধুরী
হৈমন্তিকার মৃত্যুঞ্জয়♦৯৮
মাহফুজ পারভেজ
দিনলিপি ২০২০♦৯৯
খান-চমন-ই-এলাহি
শেখ হাসিনার জন্মদিন♦১০০
মঈনুল হক চৌধুরী
শরৎ পরী♦১০১
গোলাম নবী পান্না
শরৎ ছাড়া এমন দৃশ্য♦১০২
মিজানুর রহমান মিথুন
ঠিক মনে নেই♦১০৩

অনুবাদ গল্প

মূল গল্প : মুহম্মদ মানশা ইয়াদ
ভাষান্তর : মিরন মহিউদ্দীন
জেকবের চোখদুটো♦১০৪

সাহিত্য

গাজী সাইফুল ইসলাম
সানাজ দাভুদজাদে ফার :
লাক্সিমবুগ প্রবাসী ইরানি কবি♦১১৭

পরশমণি

আল-কুরআন

১। যারা ঈমান এনেছে, দেশত্যাগ করেছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে; আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। *(সূরা আনফাল : ৭২)*

২। সুতরাং যারা দেশ ত্যাগ করেছে, মাতৃভূমি থেকে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও শহীদ হয়েছে, আমি তাদের মন্দকর্ম দূরীভূত করব এবং তাদেরকে দাখিল করব জান্নাতে যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত। *(সূরা আলে ইমরান : ১৯৫)*

৩। আল্লাহর পথে যারা শহীদ হয়, তাদের তোমরা মৃত বল না বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না। *(সূরা বাকারা : ১৫৪)*

৪। যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করি। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন। *(সূরা আনকাবুত : ৬৯)*

৫। যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদের যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি জুলুম ও অত্যাচার করা হয়েছে। *(সূরা হজ্জ : ৩৯)*

৬। হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন বাণিজ্যের সন্ধান দিব যা তোমাদের রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে আর তা হলো তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করবে তোমাদের জীবন ও ধনসম্পদ দ্বারা। *(সূরা সাফফ : ১০-১১)*

আল-হাদীস

১। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন: একদিন এক রাত দেশের সীমান্ত পাহারা দেওয়া একমাস ধরে সিয়াম পালন করা ও সালাত আদায় করার চেয়েও বেশী মূল্যবান। এ দায়িত্ব পালনকালে সে যদি মারা যায় তাহলে যে কাজ সে করছিল মৃত্যুর পরেও তা তার জন্য জারি থাকবে, তার রিযিক অব্যাহত থাকবে, কবর আযাব ও কবরের বিপদ থেকে সে নিরাপদ থাকবে। *(বুখারী শরীফ)*

২। ফুদালা ইবন উবায়দ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মৃত্যুর পর প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল নিঃশেষ হয়ে যাবে। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দেশের সীমান্ত পাহারা দেয় তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকবে এবং সে কবরের আযাব ও পরীক্ষা থেকেও নিরাপদ থাকবে। *(সুনানে আবু দাউদ, তিরমিযি)*

৩। হযরত রুবাই বিন্‌ত মু'আবিয়া (রা) বলেন, আমরা মেয়েরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করতাম। আমরা সেখানে লোকদের পানি পান করানো, খিদমত ও সেবা শুশ্রুষা এবং নিহত ও আহতদের মদীনায় নিয়ে আসার কাজ করতাম। *(বুখারী শরীফ)*

৪। প্রিয় নবী (সা) ইরশাদ করেছেন, যে লোকের কোন কন্যা সন্তান রয়েছে এবং সে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করেনি এবং ঘৃণার চোখেও দেখেনি, তার উপর নিজের পুত্র সন্তানকে অগ্রাধিকার দেয়নি, তাকে মহান আল্লাহ জান্নাত দান করবেন। *(আবু দাউদ শরীফ)*

ইমাম মালিক (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

মুহাম্মদ মিযান বিন রমজান

জন্ম ও নাম

ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ৯৩ হিজরীতে জুরুফ এলাকার যি-মেরওয়া নামক স্থানে (বর্তমান ইয়ামানে) জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ তাঁর জন্ম ৯০ হিজরী, ৯৪ হিজরী আবার কেউ কেউ ৯৫ হিজরী বলে থাকেন। অনেক জীবনী লেখকরা উল্লেখ করেছেন, তিনি মাতৃগর্ভে তিন বছর ছিলেন। কেউ কেউ দুই বছরের কথা উল্লেখ করেছেন। নাম মালিক। উপনাম আবূ আব্দুল্লাহ।

বংশনামা

মালিক বিন আনাস বিন আবূ আমির বিন আমর বিন হারিস আল-আসবাহী। তিনি আরবের প্রসিদ্ধ গোত্র কাহ্ত্বান এর উপগোত্র আসবাহ্ অন্তর্ভুক্ত, এজন্য 'আল-আসবাহী' বলে পরিচিত। [সিয়ারু আলামিন নুবালা- ৮/৪৮ পৃ.]

ইমাম মালিক (র) পবিত্র মদীনা নগরীতে এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষানুরাগী মুসলিম পরিবারে জন্মলাভ করেন। জন্মের সনের বিশুদ্ধ মত ইমাম যাহাবী (র)-এর মতামত। তিনি বলেন, ইমাম মালিক (র)-এর জন্ম সন হল ৯৩ হিজরী, যে হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খাদেম আনাস বিন মালিক (রা) মৃত্যুবরণ করেছেন। [তারতীবুল মাদারিক, ১/১১০]

ইমাম আযম আবু হানিফার (র) প্রশংসা

ইমাম মালেকের চেয়ে ইমাম আযম আবু হানিফা ১৩ বছরের বড় ছিলেন। তিন বছর ব্যবধানে ইমাম মালেক ছোট। ইমাম মালেক বাল্যকালে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেন।

একবার আবু হানিফাকে লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, মদিনার কিশোরদের মধ্যে আপনি উন্নতির কি প্রবণতা পেয়েছেন? তিনি বলেন তাদের মধ্যে কেউ যদি উন্নতি লাভ করে তবে সেই ছেলেটি হবে মালেক। আরেক বর্ণনা এমন পাওয়া যায় আবু হানিফা বলেন-আমি মদিনায় ইলম বিক্ষিপ্ত দেখছি। যদি কেউ তা সুবিন্যস্ত করে, তবে এই ছেলেটি করবে.....।

বসবাস

ইমাম মালেকের পিতামহ মালেক বিন আবু আমের নাফে ইয়ামানের একটি এলাকায় সদকা ও যাকাত উসুলের কর্মী ছিলেন। কতকের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সেখান থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন। কুরাইশ বংশের শাখা বনি তামিমের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেন। সে সুবাদে তাদের সেখানে বসবাস শুরু। পরবর্তীতে তাঁর উত্তরসূরিরা মদিনা হতে কয়েক মাইল দূরে আকিক নামক উপত্যকায় বসবাস করেন। সেখানে চাষ উপযোগী জমি এবং বাগান ছিল। তারা চাষাবাদের কাজ শুরু করেন এবং স্থায়ী আবাস স্থান গড়ে তোলেন। সেই মাটিতে ইমাম মালেকের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা।

একবার লোকেরা ইমাম মালেককে আকীক উপত্যকায় থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলেন? তিনি বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উপত্যকা পছন্দ করতেন। ভালোবাসতেন। কোন কোন সাহাবী সেখান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে মসজিদে নববীর নিকট আসতে চাইলে, রাসূল বারণ করতেন। আর বলতেন তোমরা কি মসজিদ পর্যন্ত আসা-যাওয়া সওয়াব লাভ করতে চাও না....?

তাঁর বাবা

পিতা আনাস বিন মালিকের কাছে মদীনায় প্রতিপালিত হন। তাঁর পিতা তাবে-তাবেঈন ও হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। যার কাছ থেকে ইমাম যুহুরীসহ অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেন। খোদ ইমাম মালিকও পিতার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর দাদা আবূ আনাস মালিক (র) প্রসিদ্ধ তাবেঈ ছিলেন। যিনি

উমর, আয়েশা ও আবু হুরায়রা (রা) হতে হাদীস বর্ণনা করেন (তারতীবুল মাদারিক, ১/১০৭ পৃ.)। তাঁর পিতামহ আমির বিন আমর (রা) প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন (আল ইসাবাহ ৭/২৯৮ পৃ.)। এ সম্ভ্রান্ত দ্বীনী পরিবেশে জ্ঞানপিপাসা নিয়েই তিনি প্রতিপালিত হন।

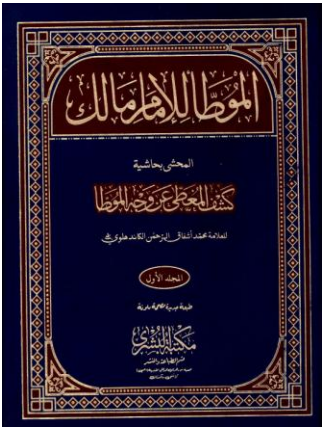

ইমাম মালিক (র)-এর বিখ্যাত গ্রন্থ মুয়াত্তা ইমাম মালিক গ্রন্থের প্রচ্ছদ

শিক্ষা জীবন

রাসূল (সা)-এর হিজরতের পর হতে আজও পর্যন্ত দ্বীনী জ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্র হলো মদীনা। সে মদীনাতে জন্মলাভ করার অর্থ হল দ্বীনী জ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রেই জন্ম লাভ করা। বিশেষ করে বংশীয়ভাবে তাঁদের পরিবার ছিল দ্বীনী জ্ঞানচর্চায় অগ্রগামী। তিনি শৈশবকালে শিক্ষা শুরু না করলেও তাঁর মাতা শিক্ষার জন্য ঘরোয়াভাবে প্রেরণা যোগান। ইমাম মালিক (র) বলেন– আমি একদিন মাকে বললাম, 'আমি পড়ালেখা করতে যাবো। মা বললেন- শিক্ষার লেবাস পড়ো। অতঃপর আমাকে ভাল পোশাক পড়ালেন। মাথায় টুপি দিলেন এবং তার উপর পাগড়ী পড়িয়ে দিলেন। এরপর বললেন– এখন পড়ালেখার জন্যে যাও।'

.....মা আমাকে ভালভাবে কাপড় পড়িয়ে দিয়ে বলতেন : যাও মদীনার প্রসিদ্ধ আলিম রাবিয়াহর কাছে এবং তাঁর জ্ঞান শিক্ষার আগে তাঁর আদব আখলাক শিক্ষা কর। এভাবে তিনি মদীনার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, ফকীহদের নিকট হতে শিক্ষালাভ করেন। (তারতীবুল মাদারিক- ১/১১৯ পৃ.)

শিক্ষার পূর্বে ব্যাবসায়ী জীবন

ইমাম মালেক জীবনে শিক্ষার প্রতি আশা আগ্রহ থাকলেও, সেদিকে ধাবিত হওয়ার সুযোগ মেলেনি। শুরুতে তিনি তার ভাইয়ের সঙ্গে কাপড়ের ব্যবসা

করতেন। বড় হবার পর দুই ভাই অংশীদার ব্যবসায় ছিলেন ভাইয়ের নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাকে দেখলে লোকজন বলতো নজরের ছোট ভাই মালেক। পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ বুঝমান হবার পর তিনি ইলমের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। শুরুতে ব্যবসায়ী এই কারণে ছিলেন যে, সে সময়ে পড়ালেখা করার তেমন সুযোগ সুবিধা ছিল না। বহুদূর হেঁটে হেঁটে গিয়ে পড়তে হতো। সবচে বড় কথা হলো ভালো শিক্ষকের অভাব। তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন ছিল খুব বেশি। জীবনধারণের আয়-রোজগার মাধ্যম ব্যাবসা। যার কারণে ইমাম মালেক উপার্জনের জন্যে ব্যবসায় নিয়োজিত।

শিক্ষাজীবনে আর্থিক সমস্যা

ইমাম মালেক পরিবার অত্যন্ত কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করতো। কাজী ইয়ায তার পিতা সম্পর্কে বলেন, ইমাম মালেকের পিতা তীর তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ইমাম মালেকের বড় ভাই সুতি কাপড়ের ব্যবসা করতেন। ইমাম মালেক তার সাথে ব্যবসা করেন। কিন্তু এতে এ পরিমাণ আয় হতো না যার দ্বারা ইমাম মালেকের নিশ্চিতভাবে ছাত্র জীবন কাটাতে পারেন। পরে আল্লাহতালা তাকে মোটামুটি সম্পদ ও স্বচ্ছলতা দান করেছেন।

দুঃখ কষ্টের এই অবস্থা অনেক সময় বড় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ইবনে কাশেম বলেন, শিক্ষাজীবন ইমাম মালিককে এই অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল যে, তিনি ঘরের ছাদের কাঠ বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে স্বচ্ছলতা এসেছে। ওই সময় ইমাম মালেকের অবস্থা ছিল তিনি মানুষের নিকট থেকে পৃথক হয়ে গাছের ছায়ায় বসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস মুখস্থ করতেন। তার বোন পিতার কাছ থেকে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন সে একা বসে হাদিস মুখস্থ করছে।

ইলমী মাকামের স্বীকৃতি

শিক্ষা এবং হাদীস শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য পরিমাপের যদি কোন মাপকাঠি থাকতো তাহলে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতো, সে মাপকাঠি অনুযায়ী ইমাম মালেকের স্থান অনেক ঊর্ধ্বে। তাকে সে সময় বুদ্ধিজীবী বলা হতো। ইয়াহিয়া বিন মাইন হাদিস এবং রিজালের পরীক্ষক ছিলেন। তিনি ইমাম মালেককে আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদিস বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। সুফিয়ান একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি বলেন, ইমাম মালেকের তুলনায় আমরা নগন্য। আমরা প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর অনুসরণ করে থাকি। ইমাম মালেক যে শাইখের নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন আমরাও তার নিকট থেকে গ্রহণ করেছি। যার রেওয়ায়েত গ্রহণ করেন নাই। আমরাও তার কোনো রেওয়ায়েত গ্রহণ করি নি।

আব্দুর রহমান বিন মাহাদী বলেন– এ বিশ্ব চরাচরে ইমাম মালেকের চেয়ে হাদীসে নববী ময়দানে আর কেউ নেই। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি যদি কারো হাদিস হিফজ করতে চান তবে কার হাদিস হিফজ করবেন? ইমাম আহমদ বলেছিলেন মালেক বিন আনাসের হাদিস হিফজ করব।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম মাহদীকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, আমি শুনেছি আপনি বলে থাকেন ইমাম মালেক ইমাম আবু হানিফা হতেও শ্রেষ্ঠ ফকিহ। তিনি বলেন আমি তা বলি না। কিন্তু আমি একথা বলে থাকি ইমাম মালেক ইমাম আবু হানিফার ওস্তাদ হাম্মাদের চেয়েও বড় ফকিহ।

ফতোয়া প্রদানের ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা

কা'নাবী (র) বর্ণনা করেন ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি অসুস্থ থাকাকালীন আমি দেখতে গেলাম। সালাম দিয়ে পাশে বসলাম। দেখতে পেলাম তিনি অঝোরে কান্না করছেন। আমি কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন হে কা'নাব! আমি কাঁদবো না তো কে কাঁদবে?

আল্লাহর কসম! আমার আকাঙ্ক্ষা যে সমস্ত মাসায়ালায় আমি নিজের মত অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছি সেগুলোর পরিবর্তে আমাকে দুররা মারা হতো। দূররার বদলায় আমার পদস্খলন গুলো ক্ষমা করা হতো। তাহলে কতই না ভালো হতো! হায় আফসোস আমি যদি আমার মত অনুযায়ী ফতুয়া না দিতাম....!

তিনি আরো বলেন– আমাকে হালাল হারাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাটা আমার কাছে খুব কঠিন মনে হয়। মদিনায় আমি এমন আলেম এবং ফকিহ দেখেছি যারা ফতোয়া দেয়ার চেয়ে মৃত্যুবরণ বহু উত্তম বলতো। আর বর্তমানে লোকদেরকে দেখা যাচ্ছে ফতোয়ার প্রতি অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এর পরিণাম পরে কি হবে তা যদি জানত? তবে হয়তো এ গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকতো। হযরত ওমর ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু শ্রেষ্ঠ সাহাবী ছিলেন। যদি তাদের সামনে কোন মাসায়ালা আসতো। তবে তারা অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে সমাবেত করে পরামর্শক ফতোয়া দিতেন। আমাদের জামানায় ফতোয়া দেয়াটা গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জন্য তাদেরকে সেই পরিমাণ ইলম দেয়া হয়েছিল। মূলত আমরা প্রকৃত ইলম থেকে বঞ্চিত। আব্দুর রহমান ইবনে মাহাদী বলেন- আমরা ইমাম মালেকের নিকট বসা ছিলাম। তখন এক মুসাফির এসে বলেন হে আল্লাহর বান্দা! আমি ছয় মাসের দূরত্ব অতিক্রম করে আপনার নিকট এসেছি। আমার শহরবাসী কয়েকটি ফতোয়া জিজ্ঞেস করার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। অতঃপর সে কয়েকটি মাসআলা জিজ্ঞেস করল। সেগুলো শুনে ইমাম মালেক বলেন এ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। কথাটা

শুনে আগন্তুক খুবই আশ্চর্য হলেন। বললেন, আমি আমার শহরবাসীকে কি জবাব দেবো। ইমাম মালেক বললেন তুমি গিয়ে শহরবাসীকে বলবে যে, মালেক বলেছে সেই সম্বন্ধে ভালো রূপ তাহকীক নেই।

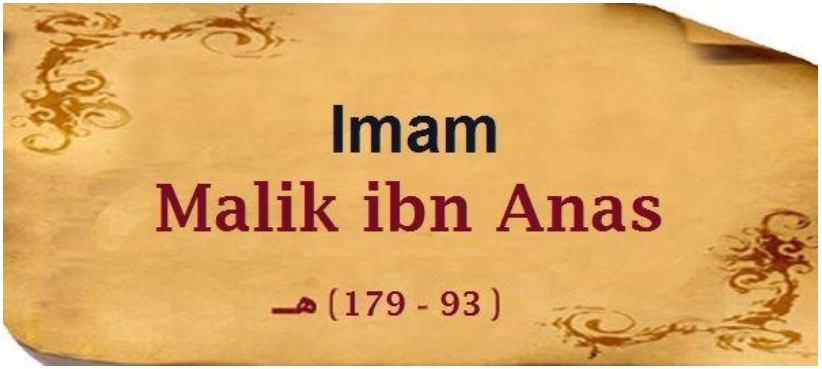

হুসাইম বিন জুবাইয়ের বলেন, আমার সামনে ইমাম মালিককে ৪৩ টি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করা হলো। তার মধ্যে ৪০ টি মাসয়ালার ব্যাপারে তিনি বলেছেন আমি জানি না।

খালেদ বিন কেরাস বলেন– আমি ইমাম মালিককে চল্লিশটি মাসআলা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তার মধ্যে তিনি পাঁচটি মাসয়ালার উত্তর দিয়েছেন। ইবনে ওহাব বলেন– অধিকাংশ মাসয়ালা ইমাম মালেক বলতেন আমি জানিনা। ইমাম মালেক বলেন কোন কোন মাসয়ালার ব্যাপারে গবেষণা করতে গিয়ে আমি সারারাত কাটিয়ে দিয়েছি। একটি মাসআলা নিয়ে দশ বছর পর্যন্ত চিন্তা করেছি কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি।

আত্মমর্যাদা

আলেম-ওলামাদের আত্মসম্মানবোধ না থাকার অর্থ হল ইলমের কদর না করা। অন্যদের চেয়ে তাদের যথেষ্ট আত্মসম্মানবোধ থাকা চাই। তাদের জীবন কেমন এমন চাই যে, তাদেরকে দেখে মানুষ যেন ইলমের প্রতি আগ্রহী হয়। ইমাম মালেক সব সময় এই বিষয়টা খেয়াল রাখতেন। আমির উমারা এবং বিচারকগণ ইমাম মালেকের খেদমতে উপস্থিত হতেন। তাদের অনেকে ইমাম মালেকের ভয়ে কম্পমান থাকতেন। বাদশাহ হারুনুর রশিদ তার তাঁবুতে হাদিসের আলোচনা করার জন্যে ইমাম সাহেবকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। ইমাম মালেক তা প্রত্যাখ্যান করে দেন। মানুষ ইলমের নিকট আসবে। ইলম মানুষের নিকট যাবেনা। তারপর হারুনুর রশীদ ইমাম মালেকের খেদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন হতে চাইলেন। ইমাম মালেক জানিয়ে দিলেন শিক্ষা মজলিসের আদব রক্ষা করা উচিত। তখন নিম্ন আসন গ্রহণ

করলেন এবং বললেন আপনি মুয়াত্তা পাঠ করুন। ইমাম মালেক বলেন ইহা আমার অভ্যাস বহির্ভূত। অতঃপর তার ইঙ্গিতে এক শাগরেদ পড়তে শুরু করলেন।

হাদিসের শিক্ষক

ইমাম মালেক হযরত আবু হাজেম থেকে হাদিসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। আবু হাজেম একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী। তিনি হযরত সাহল বিন সাঈদ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। তার কাছ থেকে হাদিস রেওয়ায়েত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হযরত সাহল বিন সাঈদ মদিনার সর্বশেষ সাহাবী। তিনি ১০০ বছর বয়সে অষ্টাশি হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তাবেয়ীদের মধ্যে তিনি হযরত মুহাম্মদ বিন মুনকাদের, সাঈদ বিন মুসাইয়াব প্রমুখ হতে হাদিসের শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ইমাম ইবনে শিহাব জহুরী হতে বয়সে বড় ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তার থেকে তিনি হাদিস শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইমাম মালেক, ইবনে উয়াইনা, সুফয়ান সাওরী, হাম্মাদ প্রমুখ তাঁর শাগরেদ।

মাসয়ালা জিজ্ঞেসের জবাব

ইমাম মালেক মাসয়ালা প্রদান করার সময় এবং ফতোয়া দেওয়ার সময় যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে খোঁজখবর নিয়ে সুনিশ্চিতভাবে জবাব দিতেন। ইবনে আবী উয়াইস বলেন– একবার ইমাম মালেক বলেন, মাঝেমধ্যে এমন মাসয়ালা পেশ করা হয় তাতে আমার আহার-নিদ্রা ব্যাঘাত ঘটে। আমি বললাম, আপনার কথা লোকেরা পাথরে খোদিত বাণীর ন্যায় শিরোধার্য মনে করে থাকে। তথাপি আপনি এমন মাথা ঘামান কেন? ইমাম মালেক তখন অতি সূক্ষ্ম উত্তর দিয়ে বলেন, হে বৎস! এই জন্যে আমার আরও অধিক সতর্ক এবং সাবধান হওয়া উচিত। এতদ্বসত্ত্বেও যদি তার কোন মাসয়ালা ভুল হয়ে গেলে কেউ তা সংশোধন করে দিত। তবে তিনি তা আনন্দচিত্তে মেনে নিতেন। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল অজুর সময় পায়ের আংগুল খিলাল করা কি আবশ্যকীয়? তিনি বললেন, এটা আবশ্যকীয় নয়। ইবনে ওহাব নামক ইমাম সাহেবের এক ছাত্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন খেলাল সম্পর্কিত একটি হাদিস আমার নিকট আছে। মালেক হাদীসটির শ্রবণ করলেন এবং বললেন হাদীসটি গ্রহণযোগ্য। এরপর থেকে ইমাম মালেক সর্বদায় সে হাদিস অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন। দীর্ঘ ৬০ বছর ক্রমাগতভাবে ফিকহ ফতোয়া সংকলন করেছেন। কাজী আসাদ বিন ফোরাত আফ্রিকি নামে তার ছাত্র ফতোয়া সম্পর্কিত প্রথম কিতাব প্রণয়ন করেন। কিতাবটির নাম দেয়া হয়েছিল আস'আদীয়া।

ইমাম মালিক (র)-এর শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম মালিক (র) অসংখ্য বিদ্যানের নিকট শিক্ষালাভ করেন। ইমাম যুরকানী (র) বলেন : 'ইমাম মালিক (র) নয়শতর অধিক শিক্ষকের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। বিশেষ করে ইমাম মালিক স্বীয় গ্রন্থ মুয়াত্তায় যে সব শিক্ষক হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদেরই সংখ্যা হল ১৩৫ জন, যাদের নাম ইমাম যাহাবী 'সিয়ার' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন [আল ইসাবাহ ৭/২৯৮ পৃ.]। উল্লেখযোগ্য কয়েকজন নিম্নরূপ–

১. ইমাম রাবীয়া বিন আবূ আবদুর রহমান (র)
২. ইমাম মুহাম্মদ বিন মুসলিম আয-যুহুরী (র)
৩. ইমাম নাফি মাওলা ইবনে ওমার (র)
৪. ইব্রাহীম বিন উক্বাহ (র)
৫. ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ বিন সা'দ (র)
৬. হুমাইদ বিন কায়স আল 'আরজ (র)
৭. আইয়ূব বিন আবী তামীমাহ আস-সাখতিয়ানী (র) ইত্যাদি।

ইমাম মালিক (র)-এর ছাত্রবৃন্দ

ইমাম মালিক (র) হলেন ইমামু দারিল হিজরাহ, অর্থাৎ মদীনার ইমাম। অতএব মদীনার ইমামের ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য কে না চায়। তাই তাঁর ছাত্র অগণিত। ইমাম যাহাবী উল্লেখযোগ্য ১৬৬ জনের নাম বর্ণনা করেছেন। ইমাম খাতীব বাগদাদী ৯৯৩ জন উল্লেখ করেন। (সিয়ারু আলামুন্নুবালা ৮/৫২)

ইমামের প্রসিদ্ধ কয়েকজন ছাত্রের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল :

১. ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস আশ শাফেঈ (র)
২. ইমাম সুফাইয়ান বিন উয়ায়নাহ (র)
৩. ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (র)
৪. ইমাম আবু দাউদ আত্তায়ালিসী (র)

৫. হাম্মাদ বিন যায়দ (র)

৬. ইসমাঈল বিন জাফর (র)

৭. ইবনে আবী আয-যিনাদ (র) ইত্যাদি। (সিয়ারু আলামুন্নুবালা, ৮/৫২-৫৪)

জ্ঞান গবেষণায় ইমাম মালিক (র)

ইমাম মালিক (র) জন্মগতভাবেই অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। মেধা শক্তি ছিল খুবই প্রখর। আবূ কুদামাহ বলেন : "ইমাম মালিক স্বীয় যুগে সর্বাধিক মেধা শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। (আৎ-তামহীদ, ১/৮১)

হুসাইন বিন উরওয়াহ হতে বর্ণিত– তিনি বলেন, "ইমাম মালিক বলেন : একদা ইমাম যুহুরী (র) আমাদের মাঝে আসলেন, আমাদের সাথে ছিলেন রাবীয়াহ। তখন ইমাম যুহুরী (র) আমাদেরকে চল্লিশের কিছু অধিক হাদীস শুনালেন। অতঃপর পরেরদিন আমরা ইমাম যুহুরীর কাছে আসলাম, তিনি বললেন : কিতাবে দেখ আমরা কি পরিমাণ হাদীস পড়েছি, আরো বললেন, গতকাল আমরা যে হাদীস বর্ণনা করেছি, তোমরা কি কিছু পড়েছ? তখন রাবীয়া বললেন : হ্যাঁ, আমাদের মাঝে এমনও ব্যক্তি আছেন যিনি গতকাল আপনার বর্ণনাকৃত সব হাদীস মুখস্থ শুনাতে পারবেন। ইমাম যুহুরী বললেন : কে তিনি? রাবিয়া বললেন : তিনি ইবনু আবী আমীর অর্থাৎ ইমাম মালিক। ইমাম যুহুরী বললেন : হাদীস শুনাও, ইমাম মালিক বলেন : আমি তখন গতকালের চল্লিশটি হাদীস মুখস্থ শুনালাম। ইমাম যুহুরী বলেন : আমার ধারণা ছিল না যে, আমি ছাড়া এ হাদীসগুলো এভাবে আর দ্বিতীয় কেউ মুখস্থ করেছে।

অতএব ইমাম মালিক (র)-এর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সাথে গভীরভাবে জ্ঞান গবেষণা ও সংরক্ষণ সম্পর্কে আর বেশি কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না।

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম মালিক (র)

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম মালিক (র) এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, হাদীস সংকলনে অগ্রনায়ক। যদিও তাঁর পূর্বে কেউ কেউ হাদীস সংকলন করেন, যেমন ইমাম যুহুরী, কিন্তু ইমাম মালিক (র)-এর হাদীসের সাধনা, সংগ্রহ ও সংকলন ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এজন্যই তাঁর সংকলিত গ্রন্থকে বলা হয়, "আল্লাহর কিতাব কুরআনের পর সর্ববিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ ইমাম মালিকের মুয়াত্তা গ্রন্থ।

তিনি হাদীস শিক্ষায় পারিবারিকভাবে উৎসাহী হলেও তাঁর অসাধ্য সাধন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অনেক অগ্রসর হয়েছেন। শয়নে স্বপনে সব সময় একই চিন্তা, কিভাবে তিনি হাদীস শিক্ষালাভ করবেন। মানুষ যখন অবসরে তখন তিনি হাদীসের সন্ধানে। ইমাম মালিক একদা ঈদের সালাতে ইমাম যুহুরীকে পেয়ে মনে করলেন, আজ মানুষ ঈদের আনন্দে ব্যস্ত, হয়ত ইমাম যুহুরীর কাছে

একাকী হাদীস শিক্ষার সুযোগ পাওয়া যাবে। ঈদের ময়দান হতে চললেন ইমাম যুহুরীর বাসায়, দরজার সামনে বসলেন, ইমাম ভিতর থেকে লোক পাঠালেন গেটে দেখার জন্য, ইমামকে জানানো হল যে, গেটে আপনার ছাত্র মালিক, ইমাম বললেন : ভিতরে আসতে বল। ইমাম মালিক বলেন, আমি ভিতরে গেলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মনে হয় তুমি সালাতের পর বাড়ীতে যাওনি? আমি বললাম : হ্যাঁ যাইনি, জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু খেয়েছ কি? আমি বললাম : না, তিনি বললেন : খাও, আমি বললাম : খাওয়ার চাহিদা নেই। তিনি বললেন, তাহলে তুমি কি চাও? আমি বললাম : আমাকে হাদীস শিখান, অতঃপর তিনি আমাকে সতেরটি হাদীস শিখালেন। (তারতীবুল মাদারিক, ১/১২১)

ইমাম মালিক (র) বেশিরভাগ সময় একাকী থাকা পছন্দ করতেন, তাঁর বোন পিতার কাছে অভিযোগ করলেন, আমাদের ভাই মানুষের সাথে চলাফিরা করে না। পিতা জবাব দিলেন : মা তোমার ভাই রাসূল (সা)-এর হাদীস মুখস্থ করায় ব্যস্ত, তাই একাকী থাকা পছন্দ করে। (তারতীবুল মাদারিক, ১/১২১)

হাদীস সংগ্রহে কঠোর সতর্কতা

ইমাম মালিক (র) হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহে সদা ব্যস্ত হলেও যেখানেই বা যার কাছেই হাদীস পেলে তিনি তা গ্রহণ করতেন না, যতক্ষণ না হাদীস বর্ণনাকারীর ঈমান-আক্বীদাহ ও সততা সম্পর্কে অবগত হতে পারতেন। বিশ্বস্ত প্রমাণিত হলে হাদীস গ্রহণ করতেন। ইমাম সুফাইয়ান ইবনে উইয়ায়না (র) বলেন : 'আল্লাহ তা'আলা ইমাম মালিককে রহম করুন, তিনি হাদীসের বর্ণনাকারীর ব্যাপারে খুব কঠিনভাবে যাচাই বাছাই করতেন (সহজেই কারো হাদীস গ্রহণ করতেন না)।' আলী বিন মাদীনী (র) বলেন : "হাদীস গ্রহণে কঠোর নীতি ও সতর্কতায় ইমাম মালিকের ন্যায় আর কেউ আছে বলে আমি জানিনা। ইমাম মালিক বিদ'আতীদের থেকে হাদীস গ্রহণ করতেন না। (আল ইনতিকা পৃ. ১৬)

সতর্কতা শুধু তিনি নিজেই অবলম্বন করেননি, বরং তিনি অন্যদেরকেও গুরুত্বারোপের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন : "হাদীস হল দ্বীনের অন্যতম বিষয়, অতএব ভালভাবে লক্ষ্য কর তোমরা কার নিকট হতে দ্বীন গ্রহণ করছ। আমি সত্তর জন এমন ব্যক্তি পেয়েছি যারা রাসূল (সা)-এর নামে হাদীস বর্ণনা করে, কিন্তু আমি তাদের কিছুই গ্রহণ করিনি। যদিও তারা অর্থ সম্পদে আমানতদার হয়, কিন্তু এ বিষয়ে তাদেরকে আমি যোগ্য মনে করিনি। অথচ আমাদের মাঝে ইমাম যুহুরীর আগমন হলে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহে আমরা তাঁর দরবারে ভীড় জমাতাম"। (আল ইনতিকা পৃ. ১৬)

সুতরাং ইমামু দারিল হিজরা বা মাদীনার ইমাম মালিক (র) রাসূল (সা)-এর হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহে যেমন জীবন উৎসর্গ করেছেন, তেমনি হাদীস সংরক্ষণে খুব কঠোর ভূমিকা রেখেছেন।

হাদীস পালনে ইমাম মালিক (র)

হাদীস শুধু কিতাবের পাতায় নয়, বরং তা বাস্তবে পালনের অন্যতম দৃষ্টান্ত হলেন ইমাম মালিক (র)। আব্দুল্লাহ বিন বুকাইর বলেন– আমি ইমাম মালিককে বলতে শুনেছি তিনি বলেন : 'আমি কোন আলিমের কাছে যখন বসেছি। অতঃপর তার কাছ হতে বাড়ীতে আসলে তার কাছে শুনা সব হাদীস মুখস্থ করে ফেলি এবং ওই হাদীসগুলির মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত বা আমল না করা পর্যন্ত ওই আলিমের বৈঠকে ফিরে যাইনি।'

হাদীস শিক্ষাদান ও ফতোয়া প্রদান

ইমাম মালিক (র) শুধু হাদীস শিক্ষা ও আমল করেই ক্ষান্ত হননি, বরং শিক্ষার পাশাপাশি মানুষকে শিক্ষা দান ও ফতোয়া প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ইমাম যাহাবী (র) বলেন, ইমাম মালিক (র.) ২১ বছর বয়সে হাদীসের পাঠদান ও ফতোয়া প্রদানে পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করেন। (সিয়ারু আলামিন্নুবালা, ৮/৫৫)

ইমাম মালিক (র) বলেন, ইচ্ছা করলেই শুধু হাদীস শিক্ষা ও ফতোয়া প্রদানের জন্য মসজিদে বসা যায় না, রবং এ ক্ষেত্রে যোগ্য ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিতে হবে, তারা যদি উপযুক্ত মনে করেন তাহলে এ কাজের জন্য নিয়োজিত হতে পারে। সত্তর জন বিজ্ঞ পণ্ডিত- শাইখের আমার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদানের পর আমি এ কাজে নিয়োজিত হই। মুস্'আব বিন আব্দুল্লাহ বলেন : ইমাম মালিককে কোন হাদীস জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি অযূ করে ভাল পোশাক পড়ে সুন্দরভাবে প্রস্তুতি নিতেন, তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি

জবাবে বলেন, এ হল রাসূল (সা)-এর হাদীসের জন্য সম্মান প্রদর্শন। (তার তীবুল মাদারিক, ১/১৫৪ পৃ.)

সারা মুসলিম বিশ্ব হতে শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র মদীনায় জ্ঞান পিপাসুরা শিক্ষার জন্য পাড়ি জমান এবং ইমাম মালিকের মত মুহাদ্দিসের নিকট হতে হাদীস শিক্ষালাভ করে ধন্য হতেন।

ইমাম মালিক (র) ফতোয়া প্রদানেও যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করতেন। জটিল বিষয়গুলো দীর্ঘ গবেষণার পর ফতোয়া প্রদান করতেন। ইবনে আব্দুল হাকীম বলেন, 'ইমাম মালিককে (র) কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি প্রশ্নকারীকে বলতেন যাও আমি ওই বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করি।' আব্দুর রহমান বিন মাহদী বলেন : ইমাম মালিক বলেন, 'কখনও এমন মাস'আলা এসেছে যে, চিন্তা-গবেষণা করতে আমার গোটা রাত কেটে গেছে।' (আল ইনতিকা, ৩৭-৩৮ পৃ)

ইমাম মালিক (র) কোন বিষয় উত্তর না দেয়া ভাল মনে করলে 'জানি না' বলতেও কোন দ্বিধাবোধ করতেন না। কারণ তিনি মনে করতেন প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া মানে জান্নাত ও জাহান্নামের সম্মুখীন হওয়া। প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যেন আখিরাতে জবাব দিহিতার সম্মুখীন হতে না হয়। (আল ইনতিকা, ৩৭ পৃ.)

সঠিক আক্বীদাহ বিশ্বাসে ইমাম মালিক (র)

আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আক্বীদাহ-বিশ্বাসের অন্যতম ইমাম হলেন ইমাম মালিক (র)। বিশেষ করে আল্লাহ তা'আলার সিফাত গুণাবলীর প্রতি ঈমানের যে ক্বায়দা বা নীতি ইমাম মালিক (র) মুতাযিলাদের প্রতিবাদে বর্ণনা করেন, সেটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নীতি। যেমন ইমাম ইবনে আবিল ইয্ আল হানাফী শারহুল আক্বীদাহ আত তাহাবিয়ায় উল্লেখ করেন। কুরআনুল কারীম ও সহীহ হাদীসের আলোকে ইমাম মালিক (র) ঈমান আক্বীদাহর সকল বিষয়ে হকপন্থীদের সাথে একমত ছিলেন।

মালেকী ফিকহ

ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এর ফিকহের ভিত্তি মদিনার ফিকহ। মদিনায় অবস্থানকারী সাহাবীদের থেকে তাবেয়ী তাবে-তাবেয়ী যে ফিকহা গ্রহণ করেছিলেন ইমাম মালেক তার উপরে ফিকহর ভিত্তি রাখেন। শাহ অলি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন– ইমাম মালেকের ফিকহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস ছায়ারূপ মনে হয়। এতে স্থান পেয়ে পেয়েছে ফারুকে আজমের শাসন পদ্ধতি। এই ফিকহর ফতোয়া সমূহ ইবনে ওমর এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের ফতোয়ার প্রতিধ্বনি। মুয়াত্তা কিতাবের দলিলাদি হাদিস সমূহ এবং আসার গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যায়ন করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম মালেকের এবং ফতোয়া হুকুমতে এলাহি

প্রতিধ্বনি ব্যতীত আর কিছু নয়। ইমাম মালেককে মদীনাবাসী জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মর্যাদার স্বীকার করা সত্ত্বেও ৭০ জন আলেমের অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত তিনি ফতোয়া প্রদান করেননি।

সরকারি ঘোষণা

শুধু মদিনা এবং হেজাজ নয়, বিভিন্ন দেশ হতে আগত প্রশ্নকারীরা ইমাম সাহেবের নিকট লেগে থাকত। হজের মৌসুমে মুসলিম বিশ্বের মুসলমান যখন আরাফার ময়দানে সমবেত হতেন এবং উলামায়ে কেরাম হারাম শরীফে একত্রিত হতেন তখন সরকারিভাবে ঘোষণা করে দেয়া হতো যে, ইমাম মালেক এবং ইবনে আবী যি'ব ব্যতীত অপর কেউ যেনো ফতোয়া না দেয়।

মাসায়ালার ব্যাপারে অটল অবিচল

ইমাম মালেক খলিফার পক্ষ হতে অসাধারণ সম্মান দেয়া হয়েছিল। অপর কাউকে যদি এরূপ সম্মান দেয়া হতো তবে তিনি খলিফার রীতিমতো সালাম দিয়ে চলতেন। কিন্তু ইমাম মালেক ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির। তাই তো তিনি শরীয়তের কোন মাসয়ালার ব্যাপারে কুরআন হাদিসের আলোকে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা প্রকাশ করতে রাজকীয় মতবাদের কোন তোয়াক্কা করেন নি। প্রশ্ন উঠলো কোন ব্যক্তিকে যদি কোন জোর প্রয়োগের কারণে নিজ স্ত্রীকে বাধ্য করে তালাক দিতে, তবে কি তালাক পতিত হবে...?

ইমাম আবু হানিফার মতে তালাক পতিত হবে। কিন্তু ইমাম মালেক এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে তালাক সাব্যস্ত হবে না।

মদিনার গভর্নর ছিলেন জাফর বিন সুলাইমান। তিনি আব্বাসীয় বংশের সন্তান। খলিফা আবু জাফর মানসুরের চাচাতো ভাই। তিনি ইমাম মালেকের উপর আদেশ জারি করলেন 'বাধ্য হয়ে যে তালাক দেয়া হয়, সে তালাক পতিত হয়', এমন ফতোয়া দিতে। কিন্তু ইমাম মালেক স্পষ্টভাবে প্রকাশ্যে স্বীয় মত ঘোষণা করেন।

ইমাম মালেকের তার এ সম্পর্কিত মতবাদ হতে বিরত রাখার জন্য সরকারের নির্দেশে দোররা মেরে শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু এতে কোনো ফল হলো না। তাকে নির্দয় ভাবে প্রহার করা হলো। তথাপি ইমাম মালেক যতক্ষণ কথা বলার শক্তি ছিল দোররার আঘাত খাওয়ার সাথে সাথে বলতেছিলেন মালেক বিন আনাস ফতোয়া দিচ্ছে যে, 'জোরজবরদস্তিতে বাধ্য হয়ে তালাক দিলে তালাক পতিত হবে না'।

তাক্বওয়া পরহেজগারী

ইমাম মালেক বলতেন যে ব্যক্তি চাই তার অন্তর আলোকিত হোক মৃত্যুর কষ্ট থেকে নাজাত লাভ করতে কিয়ামতের বিভীষিকা থেকে নিরাপদ থাকতে তার জাহেরী আমল থেকে বাতেনী আমল বেশি হওয়া আবশ্যক।

মুসআব বিন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন– ইমাম মালেকের সামনে রাসূলের নাম নেয়া হলে কিংবা রাসূলের আলোচনা করা হলে তার চেহারা বিবর্ণ ফ্যাকাসে হয়ে যেত। মাথা নিচু করে নিতেন। তখন বলতেন– আমি যা কিছু দেখেছি যদি তোমরা দেখতে তবে আমার এই অবস্থা দেখে আশ্চর্য হতে না।

মুহাম্মদ বিন মুনকাদের সাইয়েদুল কুবরা ছিলেন। আমরা তার কাছ থেকে কোন হাদিস জিজ্ঞেস করলে তিনি কান্না শুরু করতেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমি তার কাছে যাতায়াত করেছি। সব সময় তাকে তিন অবস্থায় পেয়েছি। হয়তো তিনি নামাজ রত অথবা রোযা অবস্থায় অথবা কুরআন তেলাওয়াত অবস্থায়। এই তিন অবস্থার বাহিরে আমি তাকে কখনো পাইনি। তিনি সব সময় অজু অবস্থায় থাকতেন এবং অজু সহকারে রাসূলের হাদিস বর্ণনা করতেন। ওযু ছাড়া কখনো হাদিস বর্ণনা করেননি। আমি যখন আমার অন্তরের গাফিলতি অনুভব করতাম, তখন আমি মোহাম্মদ বিন মুনকাদেরের কাছে যাই এবং তার দিকে চোখ মেলে চেয়ে থাকি। কয়েকদিন পর্যন্ত আমার অন্তরে প্রভাব বিস্তার থাকে।

প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখে পুরো ইবাদত বন্দেগিতে কাটাতেন ইমাম মালেক। কেউ এ অবস্থায় তাকে দেখলে বুঝতে পারতেন তিনি এ মাসকে ইবাদতের মাধ্যমে শুরু করেছেন। ইমাম মালেকের কন্যা ফাতেমা বলেন– প্রত্যেক রাতেই আমার আব্বা তার ওজিফা আদায় করতেন। শুক্রবারে পুরো রাত তিনি এবাদত বন্দেগিতে কাটাতেন। বিছানায় শরীর লাগাতেন না।

ইমাম মালেক নফল আমল অনেক বেশি করতেন। গোপনে নির্জনে নফল আমলের অভ্যাস ছিল অনেক বেশি। কেউ যেন না দেখে না বুঝে এবং তার বুযুর্গী না প্রকাশ পায়। তিনি সাথে একটা রুমাল রাখতেন। নামাযের সময় সেই রুমালটা বিছিয়ে সিজদা করতেন যেন কপালে দাগ না পরে। কপালের দাগের চিহ্ন থাকলে লোকেরা ভাববে তিনি খুব বেশি নফল নামায আদায় করেন। ইমাম মালেক বলেন, আমি যদি জানতে পারি ময়লা আবর্জনার স্থলে গিয়ে বসলে আমার আত্মার পরিশুদ্ধি লাভ করবে তবে আমি তাই করবো।

জনৈক ব্যক্তি বলেন– একবার আমি ইমাম সাহেবের ঘরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। তার তেলাওয়াত শুনে বাহিরে দাঁড়ালাম। এত সুন্দর সুমধুর তেলাওয়াত ছিল যে আমার চলে যেতে মন সায় দিলো না। দীর্ঘক্ষণ আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর যখন এই আয়াতে পৌঁছলেন তিনি বারবার এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেছিলেন। তার এই অবস্থা দেখে আমি সেখানে

বসলাম। বসে থাকতে থাকতে ফজরের ওয়াক্তের কাছাকাছি হয়ে গেল। এমন সময় তিনি রুকু করলেন। আমি অজু করে মসজিদে প্রবেশ করলাম। দেখলাম তিনি ওই অবস্থাতেই আছেন।

ইমাম মালেক নফল নামাযে রুকু সিজদা কিয়াম অনেক লম্বা সময় ধরে করতেন। শান্তি প্রাপ্তির পর লোকেরা তাকে পরামর্শ দিলো আপনি সংক্ষিপ্ত নামায পড়ুন। তিনি বলেন বান্দার উচিত আল্লাহর জন্য যে আমল করবে তা যেন ভালোভাবে করে। তাই আমি ধীরে সুস্থে রুকু সিজদা করে ভালোভাবে আমল করার চেষ্টা করি।

দুর্লভ গুণাবলী ও স্বভাব চরিত্র

ইমাম মালেক, সাহাবী ও তাবেয়ীঅলা গুণে গুণীজন ছিলেন। তিনি মদিনায় কখনো ঘোড়া গাধা কিংবা অন্য কোন বাহনের উপর আরোহণ করতেন না। বলতেন, যে মাটিতে রাসূলের পা লেগেছে, যে মাটিতে রাসূল শুয়ে আছেন সেই মাটিতে আমি সাওয়ার হবো কেমন করে.....? কোন কোন বর্ণনা পাওয়া যায়, ইমাম মালেক কখনো মদিনা ছেড়ে সফর করেননি। বলতেন আমি রাসূলের মদিনায় জন্মেছি। রাসূলের মদিনায় মৃত্যুবরণ করতে চাই। অন্য কোথাও সফরে গেলে আমার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে তো সেই আশাটা পূরণ হবে না।

তিনি সব সময় খামোশ থাকতেন। প্রয়োজন ছাড়া মুখ খুলতেন না। হাসতেন খুব কম। তবে মুচকি হাসি দিতেন। তার কাছে জমানোর ৪০০ দিনার ছিল। তিনি সেগুলো ব্যবসায় খাটিয়ে পরিবারের ব্যয় ভার বহন করতেন। একবার তাকে তিন হাজার দিনার হাদিয়া দেয়া হয়েছিলো। তিনি সেগুলো গ্রহণ করেননি।

তিনি ভোগবিলাস জীবন গ্রহণ করেননি। আবার একেবারে ফকির মিসকিনের জীবনী অবলম্বন করেননি। তিনি বিবি বাচ্চার প্রতি খুব খেয়াল রাখতেন। সন্তানদের সাথে সদাচরণ এবং খেল তামাশা করতেন সময় সুযোগে। স্নেহ করে আদর করে কাছে ডাকতেন। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতেন। বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতেন সময় সুযোগে। তাদেরকে নিয়ে খেল-তামাশা করতেন শুধুমাত্র বিনোদনের জন্যে। তিনি বলতেন পরিবারের সঙ্গে ভালো আচরণ করলে রাব্বুল আলামিন সন্তুষ্ট হন, সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

তিনি কলা খেতে খুব বেশি পছন্দ করতেন। মৌসুমী সকল ফলগুলো বড় খুশির সাথে খেতেন। আর বলতেন ফলমূল খুব ভিটামিনযুক্ত। এগুলো বেশি বেশি খেতে হবে।

খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৌখিন মানুষ। ভালো ভালো খাবার ছাড়া লোকমা ধরতেন না। তার ভাগিনা ইসমাঈল বলেন, দৈনিক দুই

দিরহামের গোশত কিনা হতো। কোনদিন বাদ পড়তো না। টাকা না থাকলে কখনো কখনো ব্যবসার ক্যাশ থেকে গোশত কিনতে হতো। বাবুর্চিকে বলে দিতেন শুক্রবারে যেন বেশি রান্না করা হয়। কেননা দূর থেকে ভক্ত-মুরীদানরা সাক্ষাতের জন্য আসে।

অবয় আকৃতি ও পোশাকাদি

ইমাম মালেকের দেহের বর্ণ লালসামিশ্রিত। উঁচা লম্বা। মাথাটা ছিল বড় আকারের। তার চেহারা সুন্দর ও কান্তিময়। মোচ পরিমিত। কখনো খারাপ ব্যবহার করতেন না। সুন্দর উত্তম পোশাক ব্যবহার করতেন এবং ভালো খাবার খেতেন। সাধারণত তিনি সাদা পোশাক ভালোবাসতেন। কখনো কখনো হলুদ রঙের কাপড় ব্যবহার করতেন। তার আংটিতে কালো পাথর খচিত ছিলো। তিনি দামি দামি সুগন্ধি আতর ব্যবহার করতেন। সাধারণত সুখ-সমৃদ্ধি প্রকাশ করতেন। ইলমী মর্যাদা ক্ষুন্ন না হয়। কখনো কেউ এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলতেন, এতে আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত নেয়ামতের প্রকাশ পায়।

সন্তানাদি

ইবনে হাযম লিখেন– ইমাম মালেকের দুজন ছেলে ছিলো। একজন ইয়াহিয়া। অপরজন মোহাম্মদ। মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে এ দুজনের দুর্বল। কারো কারো মতে তার একটা মেয়ে ছিল ফাতেমা নামের।

ইমাম মালিক (র)-এর প্রশংসায় উলামায়ে ইসলাম

১. ইমাম শাফেঈ (র) বলেন– 'আলিম সমাজের আলোচনা হলে ইমাম মালিক তাদের মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র, কেউ ইমাম মালিকের স্মৃতিশক্তি, দৃঢ়তা, সংরক্ষণশীলতা ও জ্ঞানের গভীরতার সমপর্যায় নয়। আর যে ব্যক্তি সহীহ হাদীস চায় সে যেন ইমাম মালিকের কাছে যায়।' (আল ইনতিকা-২৩-২৪ পৃ.)

২. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (র) বলেন– 'বিদ্বানদের অন্যতম একজন ইমাম মালিক, তিনি হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে একজন অন্যতম ইমাম, জ্ঞান-বুদ্ধি ও আদব আখলাকসহ হাদীসের প্রকৃত অনুসারী ইমাম মালিকের মত আর কে আছে?' (তারতীবুল মাদারিক- ১/১৩৩ পৃ.)

৩. ইমাম নাসাঈ (র) বলেন– 'তাবেঈদের পর আমার কাছে ইমাম মালিকের চেয়ে অধিক বিচক্ষণ আর কেউ নেই এবং হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে অধিক আমানতদার আমার কাছে আর কেউ নেই।' (আল ইনতিকা, ৩১ পৃ.)

ইমাম মালিকের (র) গ্রন্থাবলি

ইমাম মালিক (র)-এর বেশ কিছু রচনাবলী রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল–

১. আল মুয়াত্তা। হাদীসের জগতে কিছু ছোট ছোট সংকলন শুরু হলেও ইমাম মালিকের 'মুয়াত্তা' সর্ব প্রথম হাদীসের উল্লেখযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য সংকলন। এ গ্রন্থে ইমাম মালিক (র) রাসূল (সা)-এর হাদীস, সাহাবী ও তাবেঈদের হাদীস এবং মদীনাবাসীর ইজমাসহ অনেক ফিকহী মাসআলা বিশুদ্ধ সনদের আলোকে সংকলন করেন। তিনি দীর্ঘদিন সাধনার পর, কেউ বলেন চল্লিশ বৎসর সাধনার পর এ মূল্যবান গ্রন্থ সংকলন করেন। সে সময় বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে হাদীসের গ্রন্থ 'মুয়াত্তা' খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন : "কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ কুরআন এর পরই সর্ব বিশুদ্ধ গ্রন্থ হল ইমাম মালিকের "মুয়াত্তা"। [তারতীবুল মাদারিক-১/১৯১-১৯৬]

হ্যাঁ, সহীহ বুখারীর সংকলনের পূর্বে মুয়াত্তাই সর্ব বিশুদ্ধ গ্রন্থ ছিল। অবশ্য এখন সহীহ বুখারী সর্ববিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ।

২. "কিতাবুল মানাসিক।

৩. "রিসালাতুন ফিল কাদ্র ওয়ার্রাদ আলাল কাদারিয়া।

৪. "কিতাব ফিন্নুজুমি ওয়া হিসাবি মাদারিয্যামানি ওয়া মানাযিলিল কামারি।

৫. "কিতাবুস্সিরারি।

৬. 'কিতাবুল মাজালাসাত'। ইত্যাদি সহীহ সনদে প্রমাণিত যে, এ সব ইমাম মালিক (র)-এর সংকলিত ও রচিত গ্রন্থ। এছাড়াও আরো অনেক গ্রন্থ রয়েছে।

ইমাম মালিক (র)-এর মৃত্যুবরণ

ইমাম মালিক (র) ১৭৯ হি. রবিউল আউয়াল মাসে ৮৬ বছর বয়সে মদীনা মুনাওয়ারায় মৃত্যুবরণ করেন। তাকে মদীনার কবরস্থান 'বাকী'তে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাঁকে রহম করুন।♦

শু | ভ | জ | ন্ম | দি | ন |

শুভ জন্মদিন

উন্নয়ন অভিযাত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মোঃ ফরিদুল হক খান, এম.পি.

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এক ফিনিক্স পাখি, ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে এসে তিনি তার জীবনকে উৎসর্গ করেছেন এ বাংলার আপামর মানুষের কল্যাণে। সমস্ত জীবন ধরে কণ্টকাকীর্ণ এক দীর্ঘ পথ হেঁটে, সহস্র বাধা মাড়িয়ে তিনি আজকের শেখ হাসিনা। এই পথের বাঁকে বাঁকে ছিল জীবনের ঝুঁকি, শত্রুর শ্যোন দৃষ্টি তাকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখে– এটি দেশের প্রতিটি মানুষ উপলব্ধি করে। দিনে দিনে শেখ হাসিনার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে বাংলার মানুষের ভাগ্য। তার সুদক্ষ ও আন্তরিক নেতৃত্বের কারণে এদেশের মানুষ একটি উন্নত জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। কেননা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তথা ৩০ লাখ শহীদের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়েই তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশ পরিচালনা করছেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে দায়িত্ব পালন করা সফল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭৫ বছরে পা রাখলেন ২৮ সেপ্টেম্বর। শুভ জন্মদিন বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তিনি ১৯৪৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জের মধুমতি নদীবিধৌত টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছার জ্যেষ্ঠ সন্তান। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী তিনি। রাজনীতি শেখ হাসিনার জন্য নতুন কিছু নয়, জন্মসূত্রে পাওয়া এক উত্তরাধিকার। শৈশব থেকেই পিতা বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সংগ্রামী জীবনকে দেখেছেন। এই চুয়াত্তর বছরের মধ্যে অর্ধেকের বেশি সময় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। জীবনের প্রায় সিকিভাগ পার করে দিয়েছেন সরকার প্রধান হিসেবে দেশের হাল ধরে। দেশের মানুষের কল্যাণ ও উন্নতিই তাঁর একমাত্র রাজনৈতিক ধ্যান-জ্ঞান। দেশ ও মানুষের কল্যাণে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। ২১ বার তাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। মৃত্যুভয় পায়ের ভৃত্য করে ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করে যাচ্ছেন দেশমাতৃকার জন্য। এখন জীবনের একটাই প্রত্যয় জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়া। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার সফল অধিনায়ক তিনি।

দাদা শেখ লুৎফর রহমান ও দাদি সাহেরা খাতুনের অতি আদরের নাতনি শেখ হাসিনার শৈশব-কৈশোর কেটেছে টুঙ্গিপাড়ায়। শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রেহানা, শেখ রাসেলসহ তারা পাঁচ ভাই-বোন। বর্তমানে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ছাড়া কেউই জীবিত নেই। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে পিতা বঙ্গবন্ধু, মাতা ফজিলাতুন নেছাসহ সবাই ঘাতকদের নির্মম বুলেটে শাহাদাত বরণ করেন।

শেখ হাসিনার শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল টুঙ্গিপাড়ার এক পাঠশালায়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হয়ে পরিবার ঢাকায় নিয়ে আসেন। তিনি ১৯৬৫ সালে আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক, ১৯৬৭ সালে ইন্টারমিডিয়েট গার্লস কলেজ (বর্তমান বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা মহাবিদ্যালয়) থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেন। ওই বছরই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনার্সে ভর্তি হন এবং ১৯৭৩ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। শেখ হাসিনা ইন্টারমিডিয়েট গালর্স কলেজে পড়ার সময় ছাত্র সংসদের ভিপি (সহসভাপতি) নির্বাচিত হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সদস্য এবং রোকেয়া হল শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ছাত্রলীগের নেত্রী হিসেবে তিনি আইয়ুববিরোধী আন্দোলন ও ছয় দফা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধুর আগ্রহে ১৯৬৮ সালে বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গে শেখ হাসিনার বিয়ে হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের করাচিতে নিয়ে যাওয়ার পর গোটা পরিবারকে ঢাকায় ভিন্ন এক বাড়িতে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের ২৭ জুলাই শেখ হাসিনা গৃহবন্দী অবস্থায় তাঁর প্রথম সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয়ের মা হন। ১৯৭২ সালের ৯ ডিসেম্বর কন্যা সন্তান সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের জন্ম হয়।

১৯৭৫ সালের ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকাণ্ডের সময় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও বঙ্গবন্ধুর অপর কন্যা শেখ রেহানা তখন জার্মানীতে অবস্থান করছিলেন। দীর্ঘ ছয় বছর নির্বাসিত জীবন শেষে ১৯৮১ সালের ১৭ মে দেশে ফিরে আওয়ামী লীগের দুঃসময়ে দলীয় প্রধানের দায়িত্ব নেন শেখ হাসিনা। এর আগে ১৯৮১ সালে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত করা হয়। দেশের স্বাধীনতার নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগের হাল ধরেন বঙ্গবন্ধু কন্যা। টানা চার দশক ধরে দেশের এই প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দিয়ে রাজনীতির মূল স্রোতধারার প্রধান নেতা হিসেবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বঙ্গবন্ধুবিহীন বাংলাদেশে ফেরার পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র এবং দেশের মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন-

সংগ্রামে অসামান্য অবদান রাখার পাশাপাশি রাষ্ট্র পরিচালনায়ও ব্যাপক সাফল্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছে। খণ্ড খণ্ড দলকে একত্রিত করে এশিয়া মহাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন আওয়ামী লীগকে। চার দশক আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে থাকা শেখ হাসিনা সেই সঙ্গে বিশ্বের সামনে বাংলাদেশকে উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা চারবার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এরপর ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট বিজয়ের পর ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি দ্বিতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রীর শপথ নেন শেখ হাসিনা। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম নির্বাচনে আবারও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে একই বছরের ১২ জানুয়ারি টানা দ্বিতীয় ও মোট তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন বঙ্গবন্ধু কন্যা। সর্বশেষ ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ে ২০১৯ সালের ৭ জানুয়ারি চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন শেখ হাসিনা। এ ছাড়া জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনবার (১৯৮৬, ১৯৯১ ও ২০০১ সালে) আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের সফল প্রধানমন্ত্রী তাঁর নেতৃত্বে অর্থনীতির প্রতিটি সূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে একটি রোল মডেল হিসেবে পরিচিত করেছেন। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনেও তিনি বিশ্বনেতাদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

মিয়ানমারে জাতিগত সহিংসতায় পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা মুসলিমদের আশ্রয় দিয়ে সারা বিশ্বে হয়েছেন প্রশংসিত। বাংলাদেশকে নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায়। প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্বে করোনাকালেও দেশের প্রবৃদ্ধি এশিয়ায় প্রায় সব দেশের ওপরে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্থায়ী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, খাদ্যে স্বনির্ভরতা, নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ অবকাঠামো, যোগাযোগ, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, বাণিজ্য, আইসিটি খাতে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। তথাকথিত তলাবিহীন ঝুড়ির বাংলাদেশ আজকে বিশ্বে উন্নয়নের বিস্ময়। দেশের শক্তিশালী অর্থনীতির ভিত্তির বাস্তব প্রমাণ মেলে নিজস্ব অর্থায়নে দেশের সর্ববৃহৎ পদ্মা সেতু নির্মাণে। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট স্থাপন, সমুদ্রসীমা বিজয়, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু ট্যানেল নির্মাণ হচ্ছে, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ হচ্ছে, মেট্রোরেল প্রকল্প চলমান, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, এশিয়ান হাইওয়ে রোড প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে। পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ হচ্ছে। বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমা শূন্যের

কোঠায় নেমে এসেছে, নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ হয়েছে।

শেখ হাসিনা রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও কূটনৈতিক দক্ষতা দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের জন্য কুড়িয়েছেন সুনাম। দেশের জন্য বয়ে এনেছেন গৌরব ও সাফল্য। নারী হিসেবে দীর্ঘ মেয়াদে রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকার অনন্য রেকর্ড অর্জন করেছেন শেখ হাসিনা। জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মেরকেল টানা ১৬ বছর ক্ষমতায় থাকার রেকর্ড ছিল। শেখ হাসিনা টানা সাড়ে ১২ বছর হলেও চার মেয়াদে এরই মধ্যে ১৭ বছরের বেশি সময় ধরে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। এই সময়ে নিজের মেধা-মনন, সততা, নিষ্ঠা, যোগ্যতা, প্রজ্ঞা, দক্ষতা, সৃজনশীলতা, উদারমুক্ত গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের আমূল পরিবর্তন এনেছেন। প্রতিটি সেক্টরে লাগিয়েছেন উন্নয়নের ছোঁয়া। গড়েছেন ডিজিটাল বাংলাদেশ। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে করেছেন রূপান্তর। সৎ ও কর্মঠের তালিকায় বিশ্বের সেরা তিনে স্থান করে নিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধুকন্যা শুধু নিজেকেই নন, বিশ্বদরবারে বাংলাদেশকে নিয়ে গেছেন অনন্য উচ্চতায়। তিনি উন্নয়নের কাণ্ডারি। গত এক যুগ টানা ক্ষমতায় থাকা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৫৫৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত, রিজার্ভ মাত্র ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন থেকে ৪৮ দশমিক ০৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত, দারিদ্রের হার হ্রাস, মানুষের গড় আয়ু প্রায় ৭৩ বছরে উন্নীত, বিদ্যুৎ উৎপাদন ২৫ হাজার ২৩৫ মেঘাওয়াটে উন্নীত ও প্রায় শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা, সাক্ষরতার হার ৭৫ দশমিক ৬০ শতাংশ উন্নীত, বছরের প্রথম দিন প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে নতুন বই পৌঁছে দেওয়া, মাদরাসা শিক্ষাকে মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা ও স্বীকৃতি দান, মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, প্রতিটি জেলায় একটি করে সরকারি/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ, নারীনীতি প্রণয়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ, ৪-জি মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহার চালুসহ অসংখ্য ক্ষেত্রে কালোত্তীর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

বৈশ্বিক মহামারী করোনার সময় বঙ্গবন্ধুকন্যার গৃহীত পদক্ষেপ জাতিসংঘ, বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাময়িকী ফোর্বসসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসিত হয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা থেকে শুরু করে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে তিনি নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছেন।

করোনা মহামারীর বিস্তার নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম হয়েছেন। একজন সফল রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে শেখ হাসিনার অবদান আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। ইতিমধ্যে তিনি শান্তি, গণতন্ত্র, স্বাস্থ্য ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, দারিদ্র বিমোচন, উন্নয়ন এবং দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে সৌভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য ভূষিত হয়েছেন অসংখ্য মর্যাদাপূর্ণ পদক, পুরস্কার আর স্বীকৃতিতে।

আমরা যখন তার ৭৫ তম জন্মদিন পালন করছি, তিনি তখন বাংলার ঝাণ্ডা উড়াচ্ছেন বিশ্ব মঞ্চে। ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে নবম বার্ষিক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ইউএন সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের প্রেসিডেন্ট ও যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ জেফ্রি স্যাক্স বলেছেন, "পৃথিবীর দেশগুলোর টেকসই উন্নয়নের অগ্রগতি বিশ্লেষণ করি, যা প্রতিবছর জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন সমাধান নেটওয়ার্ক করে থাকে, ২০১৫ হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অগ্রগতিতে বিশ্বে প্রথম হয়েছে।"

এ বছর ২০২১ সাল, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় SDG'S Progress Award 'এ ভূষিত হয়েছেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর্থ ইনস্টিটিউট, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গ্লোবাল মাস্টার্স অফ ডেভলপমেন্ট প্র্যাকটিস এবং ইউএন সাসটেইনেবল ডেভলপমেন্ট সলুশন নেটওয়ার্ক শেখ হাসিনাকে ক্রাউন জুয়েল (মুকুটমণি) আখ্যায়িত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তি জীবন রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন বলে কোন বিষয় নেই। শেখ হাসিনাকে দেখা যায় কৃষকের আঙ্গিনায়, শ্রমিকের শিল্প-কারখানায়, দেখা যায় দুঃখী মানুষের দুয়ারে, তাকে পাওয়া যায় সংস্কৃতি জগতে, ধার্মিকের অন্তরে। তাকে পাওয়া যায় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া বাংলার মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। তার ছোঁয়া পাওয়া যায় সর্বত। তার অবস্থান দৃশ্যমান। তার মধ্যে আমি দেখছি অদম্য সাহস, সব কাজে স্বচ্ছতা এবং দেখছি একটি দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় অঙ্গীকার। তিনি গণতন্ত্রের নেত্রী, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির কাণ্ডারি, উন্নয়নের নেত্রী, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার নেত্রী। তিনি আমাদের নেত্রী জনগণের নেত্রী।

মানুষ বেঁচে থাকে তার কর্মের মাধ্যমে, বয়সের বিচারে নয়। নশ্বর এই পৃথিবী থেকে সবাইকে একদিন চলে যেতে হবে। কর্মের গুণে কাউকে মানুষ মনে রাখবে, কেউ হারিয়ে যাবে মারা যাবার সাথে সাথেই। শেখ হাসিনা এমনই একজন মানুষ যার কর্মই তাকে অমরত্ব দান করবে।

মায়ানমার এর সামরিক বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত এবং নিজ ভূমি থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গা মুসলমানদের আশ্রয় দিয়ে মায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন শেখ হাসিনা। সে সময় জাতিসংঘের মহাসচিব বলেন, "শেখ হাসিনার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে"। মমতাময়ী মায়ের মতো নিজের আচলে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের লোকদের আশ্রয় দেয়ার কারণেই ব্রিটিশ মিডিয়া শেখ হাসিনাকে "মাদার অফ হিউম্যানিটি" (মানবতার মা) হিসেবে বর্ণনা করেছে।

স্বাধীনতার পর আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলে ব্যাঙ্গোক্তি করেছিল। দূরদর্শী ভিশনারি নেতৃত্বের জাদুকরী স্পর্শে সে সময়ের ব্যাঙ্গোক্তিকে মিথ্যা প্রমাণ করে বাংলাদেশকে আজ বিশ্বের "উন্নয়নের রোল মডেলে" পরিণত করেছেন শেখ হাসিনা।

'৭৫-পরবর্তী বাঙালি জাতির যা কিছু মহৎ অর্জন তা শেখ হাসিনার নেতৃত্বেই হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার জন্মদিন, গোটা বাঙালি জাতির জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন। তাঁর জন্মদিনে নিরন্তর শুভ কামনা ও শুভেচ্ছা।♦

লেখক : মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বিশ্বের সফল নারী নেতৃত্বে শীর্ষবিন্দু স্পর্শী

শেখ হাসিনা

মিলন সব্যসাচী

বিশ্ব নন্দিত নেত্রী উন্নয়নের অগ্রগতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বিশ্বের নারী নেতৃত্বাধীন সরকার প্রধানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশিদিন দেশ পরিচালনার ঐতিহাসিক রেকর্ড করেছেন। ১৯৯৬, ২০০৯, ২০১৪ এবং ২০১৯ সালের ৭ জানুয়ারি চতুর্থ বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সময়ে প্রায় ১৮ বছর দেশ পরিচালনা করছেন। বর্তমান মেয়াদের পূর্ণ সময় সমাপ্ত হলে তার সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা হবে ২০ বছর। আন্তর্জাতিক সংস্থা

উইকিলিকসের গভীর গবেষণা থেকে জানা যায়, নারী সরকারপ্রধান হিসেবে বহুবছর দেশ পরিচালনায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার এবং শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেট ও প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রিকা কুমারা তুঙ্গার মতো নেত্রীদের পেছনের সারিতে রেখে উল্কার গতীতে এগিয়ে যাচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। স্বনামে সমুজ্জ্বল সংস্থা উইকিলিকসের জরিপে বলা হয়েছে। 'শেখ হাসিনা এখন নারীদের পুনর্জাগরণের প্রতীক।' বিশ্বে পরিচিতি ও দীর্ঘদিন ক্ষমতার থাকার বিষয়কে গুরুত্বারোপ করে এ তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এ জরিপ অনুসারে সেইন্ট লুসিয়ার গভর্নর জেনারেল ডেম পিয়ারলেত্তে লুজি সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকা নারী রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি ১৯৯৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। ২০ বছর ১০৫ দিন দেশ পরিচালনা করলেও বিশ্ব রাজনীতিতে শেখ হাসিনার মতো বহিরবিশ্বে তার ততোটা পরিচিতি নেই। দেশ বিদেশের অনেক প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকবৃন্দ বলেছেন। সফল রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা যদি শারীরিকভাবে সক্ষম ও সুস্থ থাকেন। তা হলে ডেম পিয়ারলেত্তে লুজির রেকর্ডও তিনি অনায়াসে অতিক্রম করতে পারবেন। শেখ হাসিনার বিকল্প কিংবা যোগ্য উত্তরসূরি এখনও কেউ হয়ে উঠেনি তার অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও যোগ্যতা সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবলে দেখা যায় সহসা বিকল্প সম্ভবনার আলো অত্যন্ত ক্ষীণ।

বিশ্বের নারী নেতৃত্বে সফলতার ক্রমবিকাশে আরেকটি নাম ভিগডিস ফিনবোগাদোত্তির। ১৯৮০ সালের ১ আগস্ট একটানা ১৬ বছর আয়ারল্যান্ডের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। তিনিও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে শেখ হাসিনার মতো এতোটা সুপরিচিত নন। এছাড়াও ১৪ বছর ৩২৮ দিন রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকে ডমিনিকান রিপাবলিকের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ডেম উজেনিন দেশ পরিচালনা করেছেন। আয়ারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ম্যারি ম্যাকিলিস ১৩ বছর ৩৬৪ দিন ক্ষমতায় ছিলেন। তার রাষ্ট্র পরিচালনায় সফলতা ও সক্ষমতাও প্রসংশনীয়। জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল। বর্তমান বিশ্বের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষমতাবান নারী নেতৃত্বের অন্যতম। ২০০৫ সালের ২২ নভেম্বর তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করে এখনও জার্মানের রাষ্ট্রীয় শাসনকার্য পরিচালনা করছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন ১৫ বছর। সেইন্ট লুসিয়ার গভর্নর জেনারেল পিয়ারলেত্তে আয়ারল্যান্ডের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন ২০ বছর ১০৫ দিন। ভিগডিস ফিনবোগাদোত্তির আয়ারল্যান্ডের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন ১৬ বছর। ডেম উজেনিন ডমিনিকান রিপাবলিকের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন ১৪ বছর ৩২৮ দিন। ম্যারি মিকেলিস আয়ারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে রাষ্ট্রপরিচালনা করেছেন ১৩

বছর ৩৬৪ দিন। চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল জার্মানের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ১৫ বছর যাবৎ ক্ষমতায় আছেন। এখনও রাষ্ট্র পরিচালনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন ১৫ বছর। মার্গারেট থ্যাচার যুক্তরাজ্যের সফল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষতায় ছিলেন ১১ বছর ২০৮ দিন।

চন্দ্রিকা কুমারা তুঙ্গা শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে দু'বারেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন ১১ বছর ৭ দিন। শেখ হাসিনা বাংলাদেশের সফল প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চতুর্থ বারের মতো শপথ গ্রহণ করেছেন। ইতোমধ্যেই প্রায় ১৭ বছর পিছনে ফেলে সম্মুখে এগিয়ে যাচ্ছেন কাঙ্খিত স্বপ্নের সোনালি দিগন্তের দিকে। পূর্ণ- মেয়াদকাল সমাপ্ত হলে তাঁর শাসনকাল হবে ২০ বছর।

১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন শেখ হাসিনা। তিনি মাঝখানে এক মেয়াদ ক্ষমতায় ছিলেন না। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হলে ২০০৯ সালে আবার শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করে রাষ্ট্রপরিচালনা করেন। ৫ বছরের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার ২০১৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। শেখ হাসিনা তখনও প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলেন। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও বিপুল ভোটের

ব্যবধানে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়। ২০১৯ সালের ৭ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আবার শপথ গ্রহণ করে রাষ্ট্র পরিচালনায় শেখ হাসিনা নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার ১৭ বছর পূর্ণ হয়েছে। চতুর্থ মেয়াদের ১ বছর পার করে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের সর্বোচ্চ রেকট ভঙ্গ করেছেন একমাত্র বিশ্বনন্দিত নেত্রী শেখ হাসিনা। ইন্দিরা গান্ধী, মার্গারেট থ্যাচার, অ্যাঙ্গেলা মার্কেল ও শেখ হাসিনা মাত্র চারজন নারী নেত্রী সার্বিক সফলতার শেখড়ে আরোহণ করেছেন। এরা সবাই স্বদেশকে সম্ভাবনার স্বর্ণালি দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন। চতুর্থবার ক্ষমতায় আরোহণের পর বিশ্ব স্বীকৃত ও সুপরিচিত অন্যান্য নারী নেতাদের ঐতিহাসিক কীর্তি কর্মের সর্বোচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করেছেন বিশ্বের সফল নারী নেতৃত্বের শীর্ষবিন্দুস্পর্শী শেখ হাসিনা। তার মেয়াদী শাসন আমলে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক খাতে কাঙ্খিত উন্নয়নের অগ্রগতি ব্যাপক সফলতার সাক্ষর রেখেছে। বহুমাত্রিক সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশ তার শাসন আমলেই সার্বিক উন্নয়নের সিঁড়িতে উন্নতশিরে দাঁড়িয়েছে এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের গৌরব অর্জন করেছে। যেখানে দেশের প্রতিটি মানুষের মাথাপিছু আয় ছিল ৭০০ থেকে ৮০০ ডলার। শেখ হাসিনা সরকারের শাসন আমলে মাথাপিছু আয় বেড়ে ১০০০ হাজার থেকে ৩০০০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। যে কোন দরিদ্র দেশ জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশের স্বীকৃতি পেতে হলে সেখানে মানবসম্পদ সূচক অবশ্যই ৬৬ ভাগ প্রয়োজন, সেখানে শেখ হাসিনার আমলে ৭২ দশমিক ৯ ভাগ অর্জন করেছে বাংলাদেশ। যেখানে ৩২ ভাগ অথবা এর কম। সেখানে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে এ সূচক ২৪ দশমিক ৮ ভাগে নামিয়ে এনেছে।

২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো কতৃক আয়োজিত প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে বিশ্ব ঐতিহ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে ইউনেস্কোর 'Memory of the World International' রেজিস্টার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জাতিসংঘের মতো বিশ্বসংস্থার এ সিদ্ধান্ত বিশ্বব্যাপী একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। দীর্ঘ ৪৬ বছর পরে হলেও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের কালজয়ী ভাষণ বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রনোদনাময়ী বাণী সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির মূল্যবান ও ঐতিহ্যপূর্ণ বাঙালি জাতি গর্বিত এবং আন্দোলিত। মূলত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক প্রচেষ্টা এর অন্তরালে সার্বিক প্রেরণা যুগিয়েছে। যে প্রচেষ্টায় মহাকালের মহানায়ক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশ্ববাসীর কাছে সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়িত হয়েছেন। নতুন প্রজন্মের কাছে সমাদৃত

হয়েছেন। এতেই প্রমাণিত হয় যে, প্রদৃপ্ত সূর্যের আলোকরশ্মি ক্ষণকাল মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়লেও চিরকালের জন্য ঢেকে রাখা দুরাশার স্বপ্ন শুধু। শেখ হাসিনার যোগ্যতা, দক্ষতা ও সাধনার সোনালি ফসল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও আমাদের আরেকটি যুগ-যুগান্তকারী অর্জন। ২০১৫ সালের সূচনা পর্ব হতে ২০১৮ পর্যন্ত তিন বছর গভীর গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ শেষে জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে যোগ্যতা অর্জনের স্বীকৃতিপত্র প্রদান করে। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়ক দিয়ে কাঙ্খিত গন্তব্যে এগিয়ে যাচ্ছে এরই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হচ্ছে বহুল প্রত্যাশীত এই অর্জন । ১৯১৫ সালে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। শেখ হাসিনার শাসন আমলেই বাংলাদেশ জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো (এম জি ডি) সর্বোত্তমভাবে অর্জনের স্বীকৃতি পেয়েছে। সমগ্র বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ এখন অপ্রতিরোধ্য উন্নয়ন বিস্ময়। বিশ্ববাসীর শেকড় সন্ধানী দৃষ্টিতে 'বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্ব স্বীকৃতি প্রাপ্ত।

এছাড়াও ওয়াল্ড ইকোনমিক ফোরামের ইনক্লুসিভ ইকোনমিক ইনডেক্স অনুযায়ী অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিবেশি রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে প্রবৃদ্ধিতে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। ২০১৯ সালের ২৯ আগস্ট 'দ্য স্পেক্টেটর ইনডেক্স' প্রকাশিত বিশ্বের ২৬ টি দেশের তথ্যের ভিত্তিতে শীর্ষ জিডিপি অর্জনকারী দেশের তালিকায় বাংলাদেশকে বিশ্বের সেরা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে বিশ্বসেরা বাংলাদেশ। যা বাংলাদেশের ঐতিহাসিক উন্নয়নের মাইল ফলক হয়ে থাকবে। দেশে যদি বড় ধরনের কোনো রাজনৈতিক সমস্যা না হয় আর সব কিছু যদি স্বাভাবিক গতিতে চলতে থাকে তা হলে ২০২৪ সালে বাংলাদেশ অবশ্যই উন্নয়নশীল দেশের সারিতে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। এসব অর্জনের মধ্য দিয়ে দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রতি বিশ্ব নেতৃবৃন্দের আস্থা ক্রমশ বেড়েছে। পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসকে সম্মান জানানোর জন্য ওয়াশিংটন ডিসির মেয়র মুরিয়েল বাওসার ২৬ মার্চকে বাংলাদেশ দিবস ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশের ৪৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রাক্কালে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেরিত একটি চিঠিতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ব্যাপক প্রশংসা করে বলেছেন, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক সহনশীল বহুত্ববাদী এবং মধ্যপন্থি জাতির দেশ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এ উদাহরণ বিশ্বের কাছে উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা, আর্থসামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য শান্তি ও গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের অসামান্য অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের মহত উদ্যোগ বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান কতৃক শেখ হাসিনাকে অনেক সম্মান সূচক ডিগ্রী ও পুরস্কার প্রদান করেছে। ১৯৯৭ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক অঙ্গনের প্রায় ৪০ টি পুরস্কার, পদক, ডক্টরেট ও সম্মাননা অর্জন করেছেন। এর মধ্যে জাতিসংঘের বেশ ক'টি পুরস্কারও রয়েছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র। 'ব্রিজপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্যারি বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র। ওয়ায়েদা বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান। 'অ্যাবারটি বিশ্ববিদ্যালয়, স্কাটল্যান্ড। বিশ্বভারতী, ভারত। 'ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত। 'ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব পিটার্সবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শেখ হাসিনাকে সম্মানসূচক ডিগ্রী প্রদান করেছে। ডাওফি বিশ্ববিদ্যালয়, ফ্রান্স থেকে তাকে ডিপ্লোমা প্রদান করেছে। বিশ্বশান্তির শ্বেত কপোত শেখ হাসিনা। সামাজিক কর্মকাণ্ড, শান্তি ও স্থিতিশীলতা ও সার্বিক ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য অবদান রাখার জন্য শেখ হাসিনাকে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা সম্মানিত করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ বিরাজমান গৃহযুদ্ধ অবসানের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার কালজয়ী কীর্তির জন্য ১৯৯৮ সালে ইউনেস্কো তাকে (Houphouet- Boigny) হুপে বোয়ানি শান্তি পুরস্কার প্রদান করে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ও মানবাধিকারের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসিকতা ও দূরদর্শীকতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের রানডলপ ম্যাকন উইমেন্স কলেজ ২০০০ সালের ৯ এপ্রিল শেখ হাসিনাকে মর্যাদাসূচক Pearl S.Buck পুরস্কারে ভূষিত করে।

জাতিসংঘের বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি ক্ষুধার বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শেখ হাসিনাকে সম্মানজনক সেরেস (CERES) মেডেলে প্রদান

করে। সর্বভারতীয় শান্তিসংঘ শেখ হাসিনাকে ১৯৯৮ সালে মাদার তেরেসা পদক প্রদান করে। ১৯৯৮ সালে আন্তর্জাতিক রোটারি ফাউন্ডেশন তাঁকে Paul Haris ফেলোশিপ প্রদান করে। পশ্চিমবঙ্গ সর্বভারতীয় কংগ্রেস ১৯৯৭ সালে তাঁকে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু স্মৃতি পদক প্রদান করে। আন্তর্জাতিক লায়ন্স ক্লাব কর্তৃক ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে শেখ হাসিনা Medal of Distinction পদক ও ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে Head of State পদক লাভ করেন। ২০০৯ সালে ভারতের ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট শান্তি ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অসামান্য ভূমিকা পালনের জন্য শেখ হাসিনাকে ইন্দিরা গান্ধী পুরস্কারে ভূষিত করে। এছাড়া তিনি ব্রিটেনের গ্লোবাল ডাইভারসিটি-পুরস্কার এবং ২ বার সাউথ পুরস্কারে ভূষিত হন। ২০১৪ সালে ইউনেস্কো তাঁকে শান্তির বৃক্ষ এবং ২০১৫ সালে উইমেন ইন পার্লামেন্টস গ্লোবাল ফোরাম নারীর ক্ষমতায়নের জন্য তাঁকে রিজিওনাল লিডারশিপ পুরস্কার এবং গ্লোবাল সাউথ সাউথ ডেভেলপমেন্ট এক্সপো-২০১৪ ভিশনারি পুরস্কারে ভূষিত করে। বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নে অব্যাহত সমর্থন, খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে অবদানের জন্য আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৫ সালে শেখ হাসিনাকে সম্মাননা সনদ প্রদান করে। জাতিসংঘ পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশ এং টেকসই উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখার জন্য লিডারশিপ ক্যাটাগরিতে শেখ হাসিনাকে তাদের সর্বোচ্চ পুরস্কার চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ-২০১৫ পুরস্কার ভূষিত করে। এছাড়া, টেকসই ডিজিটাল কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য International Telecommunication Union (ITU) শেখ হাসিনাকে CTs in Sustainable Development Award-2015 প্রদান করে। সর্বশেষ জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন্স ও এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাডওয়ার্ড পুরস্কারে ভূষিত হন শেখ হাসিনা।

শিক্ষাবিদ ও গবেষকরা মনে করেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতিসংঘসহ বিশ্বের খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর দেয়া এ ধরনের পুরস্কার গোটা জাতির জন্য গর্বের বিষয়। তারা আরো মনে করেন, এসব পুরস্কার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তর্জাতিক পরিচিতি এনে দিয়েছে এবং তিনি বিশ্বনেত্রীতে পরিণত হয়েছেন।♦

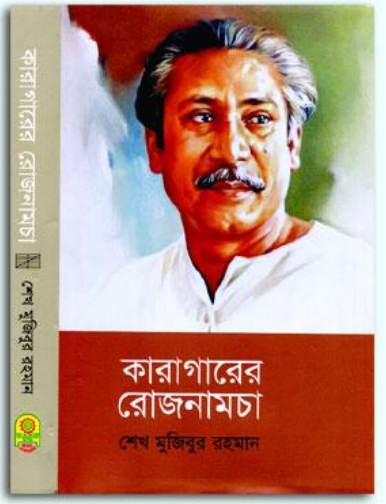

বঙ্গবন্ধুর কারাগারের রোজনামচায়

ধর্মীয় চিন্তাধারা

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
মো. আশরাফুল ইসলাম

ভূমিকা

বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবন শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ছিল চির-নিবেদিত। দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। নিঃস্বার্থভাবে জাতির নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ফসল হচ্ছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে পাকিস্তান শাসনামল পর্যন্ত ধর্মকে ব্যবহার করে যারা রাজনীতি, শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন, জুলুম, অন্যায়, অত্যাচার করেছে তাদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। এজন্য তাঁকে বহু নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। এমনকি জীবনের বিরাট একটি সময় তাঁকে কারাগারে অতিবাহিত করতে হয়েছে। এ সময়গুলোকে তিনি নষ্ট না করে গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কারাগারে লিখিত তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হলো 'কারাগারের রোজনামচা'। এতে মূলত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তথা ধর্ম সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আমলে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে কতিপয় অসাধু ব্যক্তি কর্তৃক তাঁর বিরুদ্ধে বারবার ধর্মবিষয়ক অপপ্রচার চালানো হয়েছে। এ বিষয়টিকে সামনে রেখেই আলোচ্য প্রবন্ধে অত্র গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানের পর এ গ্রন্থের আলোকে বঙ্গবন্ধুর ধর্মীয় চিন্তাধারা সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

কারাগারের রোজনামচা গ্রন্থ পরিচিতি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থ সংকলন 'কারাগারের রোজনামচা'। ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধুকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার সময় তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কারাগারে তাঁর লেখা দুটি ডায়েরি জব্দ করে। ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে এবং পুলিশের বিশেষ শাখার সহায়তায় উদ্ধারকৃত একটি ডায়েরির গ্রন্থরূপ এই 'কারাগারের রোজনামচা'। গ্রন্থটি মূলত ঐ খাতাগুলোরই মুদ্রিত সংস্করণ। ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তাঁর বিভিন্ন লেখা এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু 'আমাদের বাঁচার দাবি: ৬-দফা কর্মসূচি' ঘোষণার পরপরই তিনি কারাগারে বন্দি হন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘদিন তিনি কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। সেই সময় গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি তিনি যথাক্রমে নোট ও দিনপঞ্জি আকারে লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থটির অধিকাংশ ১৯৬৬-৬৭ সালে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে এবং কতিপয় অংশ ১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে 'আগরতলা রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা'য় ঢাকার কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে বিচারাধীন থাকাকালে লিখিত। একটি খাতায় ১৯৬৬ সালের ২ জুন থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত নিয়মিত দিনপঞ্জি

আকারে লেখা। এরপর ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ থেকে ২২ জুন ১৯৬৭ পর্যন্ত কোন কোন ঘটনা একইভাবে লিপিবদ্ধ হলেও তা ছিল অনিয়মিত।

১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে আগরতলা রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টে বিচারের জন্য নিয়ে এসে একাকি একটি ঘরে বন্দি করে রাখা হয়। দীর্ঘ পাঁচ মাস পর একটি খাতা পান লেখার জন্য। সে খাতায় গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় ঘটনা তারিখবিহীনভাবে তিনি লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হন। তারিখবিহীন হওয়ার কারণ সম্বন্ধে তিনি তাঁর লেখায় উল্লেখ করেছেন যে, ক্যান্টনমেন্টের এমন একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠে সশস্ত্র পাহারাদারদের কড়া নজরদারির মধ্যে রাত-দিন বন্দি করে রাখা হয়েছিল যে, তাঁর পক্ষে দিনক্ষণ বোঝার কোন উপায় ছিল না। উভয় স্থানের এসব লেখা সন্নিবেশিত করে বঙ্গবন্ধুর 'কারাগারের রোজনামচা' শিরোনামে আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থটি লেখার পিছনে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী ও সুখ-দুঃখের সাথী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছার অবদান ছিল অতুলনীয়। কেননা তাঁর প্রেরণা ও অনুরোধেই বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের দুর্লভ ঘটনাসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন। শুধু তাই নয়, শেখ ফজিলাতুননেছা পরবর্তীতে এই লেখাগুলো সংগ্রহ ও সংরক্ষণে অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, যা ইতিহাসের এক অনবদ্য দলিল হিসেবে আজ প্রতিষ্ঠিত।

বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'র ন্যায় এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তির পিছনেও রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি বঙ্গবন্ধুর নিজ বাড়িতেই সংরক্ষিত ছিল। অতঃপর যুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাড়িটি পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর দখলে চলে যায়। আর বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যদেরকে ধানমণ্ডির ১৮ নম্বর সড়কে একটি একতলা বাড়িতে বন্দি করে রাখা হয়। এ সময় বঙ্গবন্ধুর যোগ্য উত্তরসূরি শেখ হাসিনা অত্যন্ত সুকৌশলে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক লিখিত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। খাতাগুলো উদ্ধার করার পর শেখ হাসিনা আরামবাগে তাঁর ফুফাতো বোন মাখন ও তাঁর স্বামী আশরাফ আলীর নিকট অনেক কষ্ট করে পৌঁছে দেন। তাঁর ফুফাতো বোন পলিথিন ও ছালার চট দিয়ে খাতাগুলো বেঁধে মুরগির ঘরের ভিতরে চালের সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন, যাতে কখনো কেউ বুঝতে না পারে। অতঃপর স্বাধীনতা যুদ্ধের পর খাতাগুলো তাঁরা বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী শেখ ফজিলাতুননেছার নিকট হস্তান্তর করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে সপরিবারে হত্যা করার পর বাড়িটি সরকারি দখলে চলে যায়। পরবর্তীতে ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে সভাপতি নির্বাচিত করলে তিনি সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে দেশে ফিরে আসেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের

পর তৎকালীন সরকার তাঁকে ৩২ নম্বর বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে তিনি বাড়ির সামনে রাস্তার উপর বসে মিলাদ পড়েন। অতঃপর ১৯৮১ সালের ১২ জুন বাড়িটি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এ সময় ঐ বাড়িতে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক লিখিত কয়েকটি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যায়, যার মধ্যে 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থটিও ছিল। অতঃপর শেখ হাসিনা খুলনায় তাঁর চাচির বাসায় খাতাগুলো রেখে আসেন। কেননা ঢাকায় তখন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার থাকার মতো কোন জায়গা ছিল না। এ সময় তিনি কখনো ছোট ফুফুর বাসা আবার কখনো মেজো ফুফুর বাসায় থাকতেন।

এছাড়া বঙ্গবন্ধুর আরেকটি খাতা খুঁজে পাওয়ার ইতিহাসও 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থের ভূমিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করলে ১২ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হন। এরপর ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করলে তাঁর খাতাগুলোর মধ্যে দুটি খাতা সরকার বাজেয়াপ্ত করে। এই খাতাটি ২০১৪ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার হস্তগত হয়। এসবি (Special Branch)-এর অফিসাররা খুবই কষ্ট করে এই খাতাগুলো খুঁজে দিয়েছেন। এই খাতাটি আরও আগের লেখা। এ খাতায় জেলখানার ভিতরের অনেক কথা লিখিত রয়েছে। এই লেখার একটি নামও দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু : "থালা বাটি কম্বল, জেলখানার সম্বল।"(*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১২)

উপর্যুক্ত খাতাগুলোকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের লক্ষ্যে শেখ হাসিনা আমেরিকার জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. এনায়েতুর রহিম ও বেবী মওদুদকে সাথে নিয়ে কাজ শুরু করেন। ড. এনায়েতুর রহিম ও তাঁর স্ত্রী জয়েস রহিম খাতাগুলো অনুবাদ করেন। কিন্তু ২০০২ সালে ড. এনায়েতুর রহিম মৃত্যুবরণ করলে গ্রন্থ প্রকাশের কাজ সাময়িকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। এরপর প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন সাহেবের পরামর্শে পুনরায় কাজ শুরু করা হয়। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর সামসুল হুদা হারুন ও বাংলা একাডেমির শামসুজ্জামান খানও

সহযোগিতা করেন। পাণ্ডুলিপিগুলোকে ফটোকপি করার কাজে সহায়তা করেন আবদুর রহমান (রমা) এবং কম্পোজ করেন মনিরুন নেছা নিনু।

২০০৭ সালে শেখ হাসিনা কারাগারে বন্দি থাকাকালীন সময়ে প্রফেসর সামসুল হুদা হারুন মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তিনি কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে মুক্তি পেয়ে তিনি গ্রন্থটি প্রকাশের কাজে পূর্ণ মনোনিবেশ করেন।

'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থটি ১৭ মার্চ ২০১৭ সালে বঙ্গবন্ধুর ৯৮তম জন্মবার্ষিকীতে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৩২, আইএসবিএন নম্বর ৯৮৪ ০৭ ৫৮৯৮ ৫ এবং মূল্য চারশত টাকা। গ্রন্থটির বিশেষত্ব হলো, এর নামকরণ করেছেন বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা। শিল্পী রাসেল কান্তি দাশ অঙ্কিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি অবলম্বনে গ্রন্থটির প্রচ্ছদ ও নকশা করেছেন তারিক সুজাত। গ্রন্থস্বত্ব জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট। ইতোমধ্যে গ্রন্থটির প্রায় এক লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে।

'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থটিকে কয়েকটি ভাগে বিন্যস্ত করে সাজানো হয়েছে। যথা- ভূমিকা, কারাগারের রোজনামচা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন পরিচয় (১৯৫৫-১৯৭৫), ড. এনায়েতুর রহিম ও তাঁর সহধর্মিণী ড. জয়েস রহিম-এর বঙ্গবন্ধু শিরোনামে প্রবন্ধ, জীবনবৃত্তান্তমূলক টীকা, দুর্লভ আলোকচিত্র, আমাদের বাঁচার দাবি ৬-দফা কর্মসূচী ও নির্ঘণ্ট।

গ্রন্থটির শোভাবর্ধনে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক লিখিত বারো পৃষ্ঠার সমৃদ্ধ একটি ভূমিকা। ভূমিকাতে বাঙালি জাতির অধিকার আদায়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক যে বারবার কারাভোগ করেছেন সে ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথমে ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সময় বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার হওয়ার কারণ উল্লেখের পাশাপাশি ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের গৃহবন্দি হওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া গ্রন্থটি লেখার কারণ ও সময়কাল, গ্রন্থটির বিষয়বস্তু, গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের ইতিহাস ও গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

গ্রন্থটি প্রকাশে সার্বিক দায়িত্ব পালন, তত্ত্বাবধান ও কার্যক্রম পরিচালনা করেন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। গ্রন্থটি পরবর্তীতে দুটি ভাষায় অনূদিত হয়। ২০১৮ সালে বাংলা একাডেমি থেকে এর ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইংরেজি অনুবাদে শিরোনাম দেওয়া হয়েছে Prison Diaries (প্রিজন ডায়েরিস), যার ভাষান্তর করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি

বিভাগের অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম। এর পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৬০, আইএসবিএন নম্বর ৯৮৪ ০৭৫ ৭২২৯ এবং মূল্য পাঁচশত টাকা। অসমীয়া ভাষায় 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থটির অনুবাদ করেন বিখ্যাত বাঙালি লেখক ড. সৌমেন ভারতীয়া। অসমীয়া সংস্করণে 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থটিকে 'কারাগারের দিনলিপি' নামকরণ করা হয়েছে। ২০১৯ সালের ১৯ জুলাই এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

'কারাগারের রোজনামচা'য় ২ জুন ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত ঘটনাবহুল জেল-জীবনচিত্র স্থান পেয়েছে। তবে এর পূর্বে ২৭ থেকে ৫৪ নং পৃষ্ঠায় কারা ব্যবস্থাপনা ও তাতে বিভিন্ন পর্যায়ে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কয়েদিদের কাজে লাগানোর কথা কারাগারের নিজস্ব পরিভাষায় সবিস্তারে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন- রাইটার দফা, চৌকি দফা, জলভড়ি দফা, ঝাড়ু দফা, বন্দুক দফা, পাগল দফা, শয়তানের কল, দর্জি খাতা, মুচি খাতা, আইন দফা, ডালচাকি দফা, হাজতি দফা, ছোকরা দফা, কেস টেবিল ইত্যাদি। এ সম্পর্কে শেখ হাসিনা লিখেছেন, "এই লেখার মধ্য দিয়ে কারাগারের রোজনামচা পড়ার সময় জেলখানা সম্পর্কে পাঠকের একটা ধারণা হবে।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ৪৮)

বঙ্গবন্ধু কারাগারের ডাক্তারদের দুর্নীতিসহ তাদের চরিত্রের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। এছাড়া লুৎফর রহমান ওরফে লুদু নামে এক চোর ও পকেটমার কয়েদির জীবন-কাহিনি ও অর্থের বিনিময়ে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের তার অপকর্মে সহায়তা দান ইত্যাদির দীর্ঘ বর্ণনা এ অংশে উল্লিখিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কারাগারের কয়েদিদের জীবন-কাহিনি শুনতেন। লুৎফর রহমান লুদু ছাড়াও তিনি গোপালগঞ্জের দুর্ধর্ষ ডাকাত রহিম মিয়া, মুন্সিগঞ্জের ফেলু ময়াল, মানিকগঞ্জের ফয়েজ, কেরামত, ফণী, ইউনুস, নেছার খা, নুরুদ্দিন ওরফে নুরু, বেলাল প্রমুখ কয়েদি সম্পর্কিত বিভিন্ন কথা বা কাহিনি অত্র গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।

গ্রন্থের পরবর্তী অংশে যে সকল বিষয় উল্লিখিত হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: কারা অভ্যন্তরের দুর্নীতি, ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্ত্রী ফজিলাতুননেছার বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে আসা ও বঙ্গবন্ধুর তখনকার মনের অভিব্যক্তি, কারাজীবনের একাকিত্ব বা 'Solitary confinement'-এ দিনের পর দিন কাটানোর অসহনীয় যন্ত্রণার উল্লেখ, পাখি, গাছ, কবুতর ও কাক তাঁর জেলখানার বন্ধু বলে উল্লেখ, কারাগারে বাগান করা, দুটি হলদে পাখির কথা, কাকের উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষায় সন্ধি স্থাপন, সশ্রম কারাদণ্ড স্বরূপ ফরিদপুরে কয়েদির পোশাক পরে ৩ মাস নিজ হাতে সুতা কাটা, কয়েদিদের দ্বারা ঘানি টানিয়ে তেল ভাঙ্গার কথা, কয়েদি কর্তৃক ভালোবাসা লাভ, পাগলা গারদের কথা, পাগল ভাইদের জন্য নিজ হাতে রান্না করে পাঠানো, পিতা-মাতার প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও ভালোবাসা, শৈশবের গ্রামের স্মৃতি, বই ও খবরের কাগজ পড়ে সময় কাটানো, রাজবন্দিদের কারাজীবন, বন্দি ছাত্রদের কারাগারে পরীক্ষা দেয়ার

ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান, সন্তানদের সার্বিক খোঁজ-খবর নেয়া, সিলেটে ভয়াবহ বন্যা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ট্রেন দুর্ঘটনা, বন্যা নিয়ন্ত্রণে পাকিস্তান সরকারের অবহেলা, বাঙালি জাতির অতিশয় অদৃষ্টবাদী হওয়ার পরিণাম, ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের অবদান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার প্রসঙ্গ, দুই পাকিস্তানের বৈষম্য, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর জুলুম-নির্যাতন, বাঙালির মুক্তির দাবি ৬-দফা কর্মসূচি, পিডিএফ-এর ৮ দফা বনাম ৬-দফা, পত্রিকার ছাপাখানা বন্ধ ও বাজেয়াপ্ত হওয়ার বর্ণনা, আইয়ুব সরকারের তথাকথিত উন্নয়নের নমুনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন হরণ, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, শাসকগোষ্ঠীর অগণতান্ত্রিক আচরণের পরিণতি, ভারত-পাকিস্তানের কাশ্মীর সমস্যা, ফরাসি বিপ্লবীদের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন, চীন সফর, ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসনের সমালোচনা, সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা, শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিশ্বের সকল সমস্যার সমাধান ইত্যাদি।

গ্রন্থটিতে তিনি যা লিখেছেন সেসব ঘটনা বা বিষয়গুলো হয়তো স্বাভাবিক বা সাধারণ, কিন্তু বর্ণনাগুণে তা আর সাধারণ থাকেনি, অসাধারণ হয়ে উঠেছে। মূলত এর মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবনেরই প্রতিফলন ঘটেছে, যা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতে ও জানতে সাহায্য করে। এককথায় গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের সংগ্রামী প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে, যাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জেলে অতিবাহিত হয়েছে। এমনও হয়েছে যে এক মামলায় জামিন পেয়ে বের হয়ে আসার পথে পুনরায় জেলগেটে অন্য আরেক মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রন্থটির মাধ্যমে জানা যায় যে, প্রথম দিকে তাঁর কারাজীবন কেটেছে অতি কষ্টে। দীর্ঘ সময় 'Solitary confinement' হিসেবে তাঁকে একটি কক্ষে একা থাকতে হয়েছে। এমনকি কারাগারে তাঁকে সুতা কাটার কাজও করতে হয়েছে। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫০ সালে ঢাকায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা করা হয়। এ মামলায় তাঁকে সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে ফরিদপুর কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

'কারাগারের রোজনামচা'য় বঙ্গবন্ধুর জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাজাত কিছু পর্যবেক্ষণ আপ্তবাক্যের রূপ লাভ করেছে। তিনি বলেছেন, "জেল দিয়ে লোকের চরিত্র ভালো হয়েছে বলে আমি জানি না।" এ গ্রন্থে বারবার শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর স্বরূপ ও স্ববৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

কারাগারের রোজনামচা এমন এক গ্রন্থ যেখানে উঠে এসেছে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্বের অজানা অনেক কথা। ৬-দফার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু বাঙালির শোষণমুক্তির যে রূপরেখা দিয়েছিলেন তা বাস্তবায়নে কী বিভীষিকাময় সময় তাঁকে অতিবাহিত করতে হয়েছে, তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তিনি রোজনামচায়।

কিন্তু এর কতটুকুইবা ভাষায় প্রকাশ করা যায়। অত্যাচার নির্যাতনের কথা যতটুকু না বলে বুঝানো যায় তার চেয়ে বেশি অনুধাবন করতে হয়, উপলব্ধি করতে হয় হৃদয় দিয়ে। বঙ্গবন্ধু ত্যাগ, সহ্য, দৃঢ়তা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার যে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তার দলিল বলা চলে এই গ্রন্থটিকে।

'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থটির উপস্থাপনশৈলী এককথায় অনবদ্য। সহজ-সরল প্রাঞ্জল ভাষার ব্যবহার ইতিহাসের এই উপাদানকে করেছে সহজপাঠ্য। বঙ্গবন্ধুর বর্ণনা এতটাই নিখুঁত যে, গ্রন্থটি পাঠের সময় মনে হয় ঘটনাগুলো যেন সম্মুখে ঘটছে। এখানেই লেখক হিসেবে তাঁর স্বার্থকতা। বঙ্গবন্ধু যেভাবে বক্তৃতা দিতেন- ঠিক সেভাবে সেই ভাষা ব্যবহার করে লিখেছেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। সহজপাঠ্য এ রোজনামচায় বঙ্গবন্ধু সাহিত্যের নানা উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। এ থেকে তাঁর সাহিত্যপ্রেমের যেমন পরিচয় পাওয়া যায় তেমনই তাঁর গভীর পাঠাভ্যাসও উপলব্ধি করা যায়।

কারাগারের রোজনামচায় ধর্মীয় চিন্তাধারা

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের অধিকার আদায়ে বাঙালি জাতির কাণ্ডারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসংখ্যবার কারাবরণ করেছেন। কারাগারের সময়গুলোকে তিনি নষ্ট হতে দেননি। এ সময় তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ লেখায় আত্মনিয়োগ করেন। তন্মধ্যে অন্যতম একটি গ্রন্থ হলো কারাগারের রোজনামচা। গ্রন্থটি বাঙালি জাতির জন্য অনবদ্য একটি দলিল। এতে কারাগারের প্রকৃত রূপ, বঙ্গবন্ধুর কারাগার জীবন, বাঙালি জাতির বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। পাশাপাশি ধর্ম সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারাও এতে আলোচিত হয়েছে। নিম্নে অত্র গ্রন্থের আলোকে বঙ্গবন্ধুর ধর্মীয় চিন্তাধারা সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা উপস্থাপিত হলো।

সৃষ্টিকর্তার ফিতরত

সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারার ক্ষমতা দিয়ে সুস্থ মস্তিষ্কের প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। আমাদের জন্মগত স্বভাবজাত এই বৈশিষ্ট্যটি ইসলামের পরিভাষায় ফিতরত নামে পরিচিত। প্রতিটি মানবশিশু ফিতরতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পরিবার, সমাজ ও পরিবেশের কুপ্রভাবে নিজের অজান্তেই অনেক মানুষ তার স্বাভাবিক ফিতরত থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন গভীর দার্শনিক। তিনি তাঁর লিখনীতে সমাজ ব্যবস্থার সার্বিক চিত্র অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে সমাজের বাস্তব বিষয়াদি তিনি উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

"একটা সামান্য চোরের জীবন আমি কেন লিখছি– এ প্রশ্ন অনেকেই আমাকে করতে পারেন। আমি লিখছি এর জীবনের ঘটনা থেকে পাওয়া যাবে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার চিত্র। মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে, যারা গভীরভাবে দেখতে চেষ্টা করবেন, তারা বুঝতে পারবেন আমাদের সমাজের দুরবস্থা এবং অব্যবস্থায় পড়েই মানুষ চোর ডাকাত পকেটমার হয়। আল্লাহ্ কোন মানুষকে চোর ডাকাত করে সৃষ্টি করে না। জন্মগ্রহণের সময় সকল মানুষের দেল একভাবেই গড়া থাকে। বড় লোকের ছেলে ও গরিবের ছেলের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না, যেদিন জন্মগ্রহণ করে। আস্তে আস্তে এক একটা ব্যবস্থায় এক একজনের জীবন গড়ে ওঠে। বড়লোক বা অর্থশালীর ছেলেরা ভাল খায়, ভাল পরে, ভাল শিক্ষা পায়। আর গরিবের ছেলেরা জন্মের পরে যে অবস্থা বা পরিবেশে গড়ে উঠে এবং যাদের সাথে মেলামেশা করে তাদের স্বভাব চরিত্রই তারা পায়।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১২)

সন্তানের প্রতি ভালোবাসা

সন্তান-সন্ততির প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সন্তানদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার পরিমাণ কোন অংশে কম ছিল না। এমনকি কারাগারে থাকাবস্থায় সন্তানদের জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। আর তাঁর সাথে দেখা করতে আসলে সন্তান ও পিতার মধ্যে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হতো। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

"৮ই ফেব্রুয়ারি ২ বৎসরের ছেলেটা এসে বলে, "আব্বা বালি চলো"। কি উত্তর ওকে আমি দিব। ওকে ভোলাতে চেষ্টা করলাম ওতো বোঝে না আমি কারাবন্দি। ওকে বললাম, "তোমার মার বাড়ি তুমি যাও। আমি আমার বাড়ি থাকি। আবার আমাকে দেখতে এসো।" ও কি বুঝতে চায়! কি করে নিয়ে যাবে এই ছোট্ট ছেলেটা, ওর দুর্বল হাত দিয়ে মুক্ত করে এই পাষাণ প্রাচীর থেকে!

দুঃখ আমার লেগেছে। শত হলেও আমি তো মানুষ আর ওর জন্মদাতা। অন্য ছেলেমেয়েরা বুঝতে শিখেছে। কিন্তু রাসেল এখনও বুঝতে শিখে নাই। তাই মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে যেতে চায় বাড়িতে।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২৪)

বঙ্গবন্ধু আরও লিখেছেন,

১১ই জুন ১৯৬৭ ॥ বুধবার

"১১ তারিখে রেণু এসেছে ছেলেমেয়ে নিয়ে দেখা করতে। আগামী ১৩ই জুন ঈদের নামাজ। ছেলেমেয়েরা ঈদের কাপড় নিবে না। ঈদ করবে না, কারণ আমি জেলে। ওদের বললাম, তোমরা ঈদ উদযাপন কর।

এই ঈদটা আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার আব্বা ও মায়ের কাছে বাড়িতেই করে থাকি। ছোট ভাই খুলনা থেকে এসেছিল আমাকে নিয়ে বাড়ি যাবে। কারণ কারও কাছে শুনেছিল ঈদের পূর্বেই আমাকে ছেড়ে দিবে। ছেলেমেয়েদের মুখে হাসি নাই। ওরা বুঝতে শিখেছে। রাসেল ছোট্ট তাই এখনও বুঝতে শিখে নাই। শরীর ভাল না, কিছুদিন ভুগেছে। দেখা করতে এলে রাসেল আমাকে মাঝে মাঝে ছাড়তে চায় না। ওর কাছ থেকে বিদায় নিতে কষ্ট হয়। আমিও বেশি আলাপ করতে পারলাম না শুধু বললাম, "চিন্তা করিও না। জীবনে বহু ঈদ এই কারাগারে আমাকে কাটাতে হয়েছে, আরও কত কাটাতে হয় ঠিক কি! তবে কোনো আঘাতেই আমাকে বাঁকাতে পারবে না। খোদা সহায় আছে।" ওদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় রেণুকে বললাম, বাচ্চাদের সবকিছু কিনে দিও। ভাল করে ঈদ করিও, না হলে ওদের মন ছোট হয়ে যাবে। রাত্র ১০টায় হৈ চৈ, আগামীকাল ঈদ হবে।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২০১)

অন্যের ক্ষতি না চাওয়া

অন্যের সর্বনাশ করে নিজের স্বার্থ হাসিল করা অধিকাংশ মানুষের স্বভাব। কতিপয় রাজনীতিবিদ অন্যের ক্ষতি করাকে নিজের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু রাজনীতির ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন শান্তিকামী একজন উদার মনের নেতা। সকলের মঙ্গলের জন্য যিনি আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। এমনকি নিজে সমূহ ক্ষতির শিকার হলেও কোনক্রমেই অন্যের ক্ষতি কামনা করতেন না। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

"একই জেলে আরও রাজবন্দি আছে, তারা একঘরে থাকে, তাদের সামনেই পাক হয়। আর আমাকে সেই একই জেলে একাকি থাকতে হচ্ছে। তবে মাসে শুধু একবার গোপালগঞ্জ যেতে হয় ফরিদপুর থেকে। স্টিমার, নৌকা, গাড়িতে বেশ একটু খোলা বাতাস খাইতাম। যদিও কথা বলা নিষেধ, তবুও আস্সালামু আলাইকুম নিষেধ না। আমাকে কিছু কিছু মানুষ চিনতো। তাই সকল জায়গায় কিছু চেনাশোনা

মানুষ পাওয়া যেতো, আস্সালামু আলাইকুম করে শেষ করতাম, তা না হলে সিপাহিদের চাকরি যাবে। কারণ আইবি কর্মচারীও আছে। একবার আমাকে কে যেন মিষ্টি দিয়েছিল মাদারীপুর স্টেশনে। সেই মিষ্টি কেন আমি খেলাম তাতে সিপাহিকে কৈফিয়ত দিতে দিতে জান সারা হয়ে গেছে। একজন নাকি সাসপেন্ড হতে যাচ্ছিল, হাত পাও ধরে বেঁচে গেছে তাই ওদের জন্য কারও সাথে আলাপও করতাম না। যদি কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করত বলতাম, 'আমি কয়েদি, কথা বলা নিষেধ'। আমার জন্য ওদের ক্ষতি হবে কেন!" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ৪১-৪২)

সালাম-আদাব বিনিময়

পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় সম্প্রীতি প্রকাশার্থে মুসলিম সংস্কৃতি অনুযায়ী সম্ভাষণ জানানোর রীতি হলো সালাম। সালামকে শান্তি ও কল্যাণের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সালাম আদান-প্রদান মুসলমানদের পারস্পরিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। অপর মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের সময় বঙ্গবন্ধু সর্বদা সালাম প্রদান করতেন। এমনকি বন্দি থাকাকালীন সময়েও এর কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

> "যদিও কথা বলা নিষেধ, তবুও আস্সালামু আলাইকুম নিষেধ না। আমাকে কিছু কিছু মানুষ চিনতো। তাই সকল জায়গায় কিছু চেনাশোনা মানুষ পাওয়া যেতো, আস্সালামু আলাইকুম করে শেষ করতাম, তা না হলে সিপাহিদের চাকরি যাবে। কারণ আইবি কর্মচারীও আছে।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ৪১-৪২)

অন্যত্র বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

> "এঁরা ত্যাগী রাজবন্দি দেশের জন্য বহু কিছু ত্যাগ করছেন। জীবনের সবকিছু দিয়ে গেলেন এই নিষ্ঠুর কারাগারে। আমি তাঁদের সালাম পাঠালাম। তাঁরা জানেন, আমাকে একলা রেখেছে, খুবই কষ্ট হয়, তাই বোধ হয় তাঁদের এই সহানুভূতি।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১৩১)

আলেমের প্রকৃতি ও স্বরূপ

বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ। স্বভাবতই এখানে আলেম-ওলামার প্রাচুর্য। পাকিস্তানি আমল থেকেই এদেশে ইসলাম প্রচার-প্রসারে আলেমগণ গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। ফলে আলেমগণকে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত সম্মানের আসনে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু কতিপয় ভণ্ড-প্রতারক ব্যক্তি আলেমের সম্মানে ভূষিত হওয়ার জন্য আলেমের রূপ ধারণ করে মানুষকে যুগ যুগ ধরে ধোঁকা দিয়ে আসছে। তাই বলা যায় যে, আমাদের দেশে ভালো-মন্দ উভয়

প্রকার আলেম বিদ্যমান। এটা শুধু আলেমদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং সকল পেশা ও শ্রেণির ক্ষেত্রেই এরূপ পার্থক্য রয়েছে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন গভীর দার্শনিক। তাই তো তাঁর লিখনীতে উভয় প্রকার আলেমের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে এভাবে:

"জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই মওলানা সাহেব কি মামলায় এসেছেন।' আমাকে এক 'পাহারা' বললো, 'জানেন না, 'রেপ কেস'; একটা ছাত্রীকে পড়াতো তার উপর পাশবিক অত্যাচার করেছে, মসজিদের ভিতর। মেয়েটার ১২/১৩ বৎসর বয়স, চীৎকার করে উঠলে লোক এসে দেখে ফেলে। তারপর ধরে আচ্ছামত মারধর করে। জেলে এসে কয়দিন তো হাসপাতালেই থাকতে হয়েছে। আমি বললাম, 'হাজতে এসে ধর্ম প্রচার শুরু করেছে'। বেটা তো খুব ভণ্ড। জমাইছে তো বেশ।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ৪৩-৪৪)

পক্ষান্তরে প্রকৃত আলেমের প্রশংসায় বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

"আবার অনেক মওলানা মৌলবী সাহেবরা আছেন যাঁরা কাজ করেন, পরের জন্যে দেওয়া অর্থ কড়ি নেন না, আর বিবাহও একটা করেন। কারণ তাদের মন পবিত্র।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ৪৪)

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা

বঙ্গবন্ধুও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি শুধু স্বদেশ নয়, বরং সমগ্র পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের কথা ভাবতেন। তিনি একটি সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থার স্বপ্ন দেখতেন। তাই তো তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পৃথিবীর সকল প্রান্তের নির্যাতিত মানুষের মুক্তির উপায় খুঁজতেন। এমনকি কারাপ্রকোষ্ঠে বন্দি অবস্থায়ও তিনি ভিনদেশি নিপীড়িত মানুষের কথা ভেবে কষ্ট পেতেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

৩রা জুন ১৯৬৬ ॥ শুক্রবার

"জেনারেল মোবুতু যে পথ বেছে নিয়েছে সে পথ বড় কণ্টকাকীর্ণ। রক্তের পরিবর্তে রক্তই দিতে হয়। এ কথা ভুললে ভুল হবে। মতের বা পথের মিল না হতে পারে, তার জন্য ষড়যন্ত্র করে বিরুদ্ধ দলের বা মতের লোককে হত্যা করতে হবে এ বড় ভয়াবহ রাস্তা। এ পাপের ফল অনেককেই ভোগ করতে হয়েছে।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ৫৯)

কয়েদি কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর জন্য দোয়া কামনা

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা। তিনি যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই সাধারণ মানুষের হৃদয় নিংড়ানো গভীর ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন। এমনকি কারাগারে থাকাকালীন সময়েও এর কোনরূপ ব্যতিক্রম

হয়নি। কারাগারে ছিল অদ্ভুত অদ্ভুত লোকদের বাস। এতদত্ত্বেও কারাগারের ভেতরে চলাফেরার সময় সাধারণ কয়েদিরা তাঁর সাক্ষাৎ লাভের জন্য এগিয়ে আসত। শুধু তাই নয়, এসকল কয়েদি সর্বদা নামাজ পড়ে তাঁর জন্য দোয়াও করত। এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

৩রা জুন ১৯৬৬ ॥ শুক্রবার

"আমার বাবুর্চি একটু চালাক-চতুর ছেলে, কেরামত নাম। বলে, 'স্যার আপনি তো জানেন না– যেখানে দুইশত তিনশত কয়েদি থাকে তারা নামাজ পড়ে আপনাকে দোয়া করে। তারা বলে, আপনি ক্ষমতায় থাকলে তাদের আর চিন্তা থাকতো না।' দুঃখ হয়, এদের কোনো কাজেই বোধ হয় আমি লাগব না। অনেক গল্প শুনলাম– কয়েদিরা কি বলে সে সম্পর্কে। তবে একথা সত্য, যখন আমি জেল অফিসে যাই তখন কয়েদিদের সাথে দেখা হলে, জেল অফিসারদের সামনেই আমাকে সালাম দিতে থাকে। যারা দূরে থাকে তারাও এগিয়ে আসে। বুড়া বুড়া দু'একজন বলেই ফেলে, 'বাবা, আপনাকে আমরা দোয়া করি।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ৬০)

পিতা-মাতার জন্য দোয়ার শৈলী

বঙ্গবন্ধুও তাঁর বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কায়মনোবাক্যে দোয়া করতেন। তিনি তাঁদের দীর্ঘ হায়াত কামনা ও সুস্থতার জন্য দোয়া করতেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

৪ঠা জুন ১৯৬৬ ॥ শনিবার

"সন্ধ্যা হয়ে এল। একটু পরে ভিতরে যেতে হবে। তাই একটু হাঁটাহাঁটি করলাম। রুমে বসে লেখাপড়া করা ছাড়া উপায় কি! তাই পড়লাম বইটা নিয়ে। পরে আপন মনে অনেকক্ষণ চুপ করে ভাবতে লাগলাম। মনে পড়ল আমার বৃদ্ধ বাবা-মার কথা। বেরিয়ে কি তাঁদের দেখতে পাব? তাঁদের শরীরও ভাল না। বাবা বুড়া হয়ে গেছেন। তাঁদের পক্ষে আমাকে দেখতে আসা খুবই কষ্টকর। খোদার কাছে শুধু বললাম, "খোদা তুমি তাঁদের বাঁচিয়ে রেখ, সুস্থ রেখ।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ৬৩)

পিতা-মাতার প্রতি ভালোবাসা

পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা বঙ্গবন্ধুর ছিল আজীবন। জেলে থাকাকালীন সময়েও সেই ভালোবাসার কোনরূপ কমতি ছিল না। নিজ পিতা-মাতার খেদমত করতে পারছিলেন না বলে তাঁর মনে অনেক কষ্ট ছিল। এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

১১ই জুন ১৯৬৬ ॥ শনিবার

"জেলার সাহেবকে খবর দিলাম, আমি দেখা করতে চাই। তিনি খবর পাঠালেন নিজেই আসবেন দেখা করতে। তিনিও শুনেছেন মায়ের অবস্থা ভাল না।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ৮০)

অন্যত্র বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

১৩ই জুন ১৯৬৬ ॥ সোমবার

"মা আরোগ্যের দিকে যেতেছে। ছোট ভাই নাসের তাকে খুলনায় নিয়ে এসেছে চিকিৎসার জন্য। মনটা আমার একটু ভাল। বিকালে আবার পূর্বের মতো প্রায় এক ঘণ্টা জোরে জোরে হাঁটাহাঁটি করি। আমার বাঁচতে হবে, অনেক কাজ বাকি রয়েছে।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ৮৮)

বঙ্গবন্ধু আরও লিখেছেন,

"অনেক কথা মনে পড়তে লাগলো। বিশেষ করে আমার আব্বা ও মায়ের কথা। খবর পেলে এই বৃদ্ধ বয়সে দুইজনের কি অবস্থা হবে? আব্বার বয়স ৮৪ বৎসর আর মায়ের বয়স ৭৫ বৎসর। আর কতদিনই বা বাঁচবেন! দুঃখ পেয়ে আঘাত সহ্য করতে না পারলে যে কোনো অঘটন হয়ে যেতে পারে। বোধ হয় আমি আর দেখতে পাব না।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২৫৬)

সৃষ্টিজীবের প্রতি ভালোবাসা

বঙ্গবন্ধু ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ। তিনি শুধু মানুষকেই ভালোবাসতেন না, বরং গাছ-পালা, পশু-পখির ওপরও ছিল তাঁর ভীষণ দুর্বলতা। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

১১ই জুন ১৯৬৬ ॥ শনিবার

"বাইরে বসে দেখতে লাগলাম, একটা মোরগ একটা মুরগি আর একটা বাচ্চা মুরগি আপন মনে ঘুরে ঘুরে পোকা খেতেছে। আমার বাবুর্চি খাবার থেকে কোনোমতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া এই কয়টা মুরগি জোগাড় করেছে। ছোট ছোট যে মাঠগুলি পড়েছিল আমার ওয়ার্ডে সেগুলোতে দূর্বাঘাস লাগাইয়া দিয়াছিলাম। এখন সমস্ত মাঠটি সবুজ হয়ে উঠেছে। বৃষ্টি পেয়ে তাড়াতাড়ি বেড়ে চলেছে। দেখতে বড় সুন্দর হয়েছে জায়গাটি। এরই মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় মুরগিগুলো। অনেকক্ষণ বসে রইলাম। ফুলের গাছ চারদিকে লাগাইয়াছিলাম, নতুন পাতা

ছাড়তে শুরু করেছে। বড় চমৎকার লাগছে।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ৮০)

অন্যত্র বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

২২শে জুলাই ১৯৬৬ ॥ শুক্রবার

"আমার তিনটা মুরগির মধ্যে একটা মুরগির ব্যারাম হয়েছে। দুইটা ডিম দেয়। যে মুরগিটার ব্যারাম হয়েছে, সেটা দুই-চারদিনের মধ্যেই ডিম দিবে। মুরগিটা দেখতে খুব সুন্দর। ওকে ডেকে আমি নিজেই খাবার দিতাম। ওষুধ দেওয়া দরকার। প্রথমে পিঁয়াজের রস, তারপর রসুনের, যে যাহা বলে তাহাই খাওয়াতে থাকি। দেখলাম, এত অত্যাচার করলে ও শেষ হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে পানি, কিছু খাবার খেতে দেই ও মাথা ধোয়াইয়া দেই। বিকালের দিকে অবস্থা বেশি ভাল লাগে নাই। কি হয়, বলা যায় না। মনটা খারাপ করে ছয় সেলের কাছে যেয়ে দাঁড়াই।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১৭৪)

বঙ্গবন্ধু আরও লিখেছেন,

৪ঠা আগস্ট ১৯৬৬ ॥ বৃহস্পতিবার

"২৬ সেলে যারা সিকিউরিটি আইনে বন্দি আছেন, বহুদিন ধরেই আছেন। ধীরেন বাবু ওখানে ফুলের বাগান করেন। আমি শুনেছি এত সুন্দর বাগান নাকি ঢাকা শহরেও নাই। ঐ বাগানটা আমি ১৯৬২ সালে শুরু করি, তখন ওখানে টমেটোর বাগান ছিল। কিছুদিন পরে আমি খালাস হয়ে যাই তখন থেকে তাঁহারা ওখানেই আছেন। আমি খবর দিয়েছিলাম কয়েকটা গোলাপ ফুলের চারা দিতে। আজ বিকালে তিনটা লাল গোলাপের চারা পাঠাইয়া দিয়েছেন। আমি লেগে পড়লাম বাগানে, তাড়াতাড়ি গর্ত করে, সার দিয়ে লাগাইয়া দিলাম। এত ইটের টুকরা পরিষ্কার করতে জান শেষ হয়ে যায়। আমার বাগানটাও এখন সুন্দর হয়ে উঠেছে। দেখতে বেশ লাগে। এইত আমার কাজ। বই পড়া ও বাগান করা।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১৯০)

আল্লাহ্ তা'আলার রহমত

আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বঙ্গবন্ধুর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি সবসময় আল্লাহ্ তা'আলার রহমত কামনা করতেন। আল্লাহ্ তা'আলার রহমত থেকে কোনদিন তিনি নিরাশ হননি। এমনকি তাঁর লিখনীতেও আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের কথা বিবৃত হয়েছে। তিনি লিখেছেন,

১১ই জুন ১৯৬৬ ॥ শনিবার

"আধা ঘণ্টা পরে জেলের ডাক্তার সাহেবদের সাথে নিয়ে আমাকে দেখতে আসলেন। চিন্তা করে শরীর খারাপ করতে নিষেধ করলেন। খোদার রহমতে মা ভাল হয়ে যাবেন তাহাও বললেন। খুব খোদাভক্ত লোক। এই বয়সে হজ্ব করেও এসেছেন।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ৮০)

অন্যের দুঃখে দুঃখী হওয়া

বঙ্গবন্ধু ছিলেন জনদরদী নেতা। এজন্যই সাধারণ জনগণ কোন ধরনের ক্ষতি বা দুঃখ-কষ্টে পতিত হলে তাদের দুঃখে তিনিও সমভাবে ব্যথিত হতেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

১১ই জুন ১৯৬৬ ॥ শনিবার

"সিলেটে ভয়াবহ বন্যায় বহু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আবার অনেক জায়গায় ঝড়েও যথেষ্ট মানুষ মারা গেছে ও ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে। জানি না সরকারি সাহায্য কত পরিমাণ পৌঁছাবে। সরকারি সাহায্যের নমুনা আমার জানা আছে, কারণ কক্সবাজারের ধ্বংসলীলা আমি দেখে এসেছি।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ৮৩)

অন্যত্র বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

১৩ই জুন ১৯৬৬ ॥ সোমবার

"খবরের কাগজ এসেছে। আমিও এর মধ্যে খেয়ে নিয়েছি। সিলেটের বন্যায় দেড়লক্ষ লোক গৃহহীন। ১০ জন মারা গেছে। কত যে গবাদি পশু ভাসাইয়া নিয়া গেছে তার কি কোনো সীমা আছে! কি করে এদেশের লোক বাঁচবে তা ভাবতেও পারি না। তার উপর আবার করের বোঝা।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ৮৭)

ইসলামের খেদমতে পাকিস্তানি রূপ

ভারত-পাকিস্তান বিভক্তির পর নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা সুবিধাজনক ছিল না। অন্য দেশের সাহায্য-সহযোগিতায় দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থাকে চালু রাখা হয়েছিল। দেশের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান ছিল খুবই নিম্নমানের। এতদসত্ত্বেও নিজ দেশের অসহায় মানুষদেরকে সহযোগিতা না করে অন্য দেশকে সাহায্য-সহযোগিতা করার বিষয়টি ছিল একেবারে হাস্যকর। এদিকে সরকার কর্তৃক ট্যাক্সের বোঝা

বাড়ানোর ফলে জনগণের ওপর জুলুমের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। সেই পাকিস্তান আবার অন্য দেশকে সাহায্য করছে, এমন একটা খবর সংবাদপত্রে পড়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

১৩ই জুন ১৯৬৬ ॥ সোমবার

"পাকিস্তান নাকি ইন্দোনেশিয়াকে চৌদ্দ কোটি টাকা ঋণ দিতে রাজি হয়েছে। যে সরকার ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দুনিয়া ভর ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমেরিকা সাহায্য না দিলে যারা বাজেট পেশ করতে পারে না, দিন দিন জনগণের উপর করের বোঝা চাপাইয়া অতিষ্ঠ করে তুলেছে, তারা আবার ঋণ দিতে রাজি! এভাবেই আমরা ইসলামের খেদমত করছি! কারণ না খেয়ে অন্যকে খাওয়ানো তো ইসলামের হুকুম। দয়ার মন আমাদের! এমন প্রেম ভালোবাসা-ই তো আমাদের নীতি হওয়া উচিত! কাপড় যদি কারও না থাকে তাকে কাপড়খানা খুলে দিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়ি চলে আসবা। আমাদের সরকারের অবস্থাও তাই।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ৮৭-৮৮)

স্বৈরাচার শাসকের রূপ

পাকিস্তানের রাজনীতির সাথে বঙ্গবন্ধু বরাবরই সম্পৃক্ত ছিলেন। ফলে শাসকদের প্রকৃত চরিত্র তার কাছে উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি ইচ্ছে করলে পাকিস্তানি শাসকদের সঙ্গে মিলে ক্ষমতার মসনদে আসীন হতে পারতেন। কিন্তু নিজের নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে জনগণের সাথে বেইমানি করে স্বৈরাচারের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করার বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর কাছে ছিল খুবই অপছন্দ। তিনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে একবার সৎ পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে সে কথা বাস্তবে প্রতিফলিতও হয়েছিল। ভুট্টো মন্ত্রিত্ব থেকে বাদ পড়েন। এ সময় বঙ্গবন্ধু কারাগারে অন্তরীণ। খবরটি শুনে বঙ্গবন্ধু তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন,

১৯শে জুন ১৯৬৬ ॥ রবিবার

"ভাই ভুট্টো আমার কথাগুলি মনে করে দেখবেন নিশ্চয়ই। যখন আমার সাথে মোলাকাত হয়ে গিয়াছিল তখন তাকে বলেছিলাম, বেশি দিন আর বাকি নাই, আপনারও দিন ফুরাইয়া এসেছে। ডিকটেটরের ধর্ম নাই। সে শুধু নিজকে চিনে এবং নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলে কাহাকেও ছাড়ে না।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১০৮)

সঠিক ধর্মীয় বিশ্বাস

বঙ্গবন্ধু ইসলামের সঠিক মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি ইসলামের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন। ১৯৬৬ সালে দেশে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিলে সে সময়কার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

২০শে জুন ১৯৬৬ ॥ সোমবার

"ভয়াবহ বন্যায় পূর্ব বাংলার মানুষ সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। প্রত্যেক বৎসর এ রকম হলে মানুষ বাঁচবে কেমন করে? এখনই দেশের অবস্থা খারাপ। তারপর আছে ট্যাক্স বা কর। আবার বন্যায় ফসল নষ্ট। এই দেশের হতভাগা লোকগুলি খোদাকে দোষ দিয়ে চুপ করে থাকে। ফসল নষ্ট হয়েছে, বলে আল্লা দেয় নাই, না খেয়ে আছে, বলে কিসমতে নাই। ছেলেমেয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়, বলে সময় হয়ে গেছে বাঁচবে কেমন করে! আল্লা মানুষকে এত দিয়েও বদনাম নিয়ে চলেছে। বন্যা তো বন্ধ করা যায়, দুনিয়ায় বহু দেশে করেছে। চীন দেশে বৎসরে বৎসরে বন্যায় লক্ষ লক্ষ একর জমি নষ্ট হতো। সে বন্যা তারা বন্ধ করে দিয়েছে।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১০৯-১১০)

বহু রাষ্ট্র-সমাজ যেকোনো ব্যর্থতা, অবহেলার দায় আল্লাহ্ তা'আলার ওপর চাপিয়ে দেয়। কেননা গরিব মানুষদের মনকে শাসকরা সেভাবেই তৈরি করে রাখে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর মতে, মানুষের নিজের কর্তব্য, রাষ্ট্রের দায়িত্বে অবহেলা কখনোই মাফ পেতে পারে না। বাংলাদেশের নিয়মিত বন্যা ও তার ক্ষতির দায়দায়িত্বের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

২০শে জুন ১৯৬৬ ॥ সোমবার

"হাজার কোটি টাকা খরচ করে ক্রুগ মিশনের মহাপরিকল্পনা কার্যকর করলে, বন্যা হবার সম্ভাবনা থাকে না। এমনকি বন্যা হলেও, ফসল নষ্ট করতে পারবে না। এ কথা কি করে এদের বোঝাব! ডাক্তারের অভাবে, ওষুধের অভাবে, মানুষ অকালে মরে যায়– তবুও বলবে সময় হয়ে গেছে। আল্লা তো অল্প বয়সে মরবার জন্য জন্ম দেয় নাই। শোষক শ্রেণি এদের সমস্ত সম্পদ শোষণ করে নিয়ে এদের পথের ভিখারী করে, না খাওয়াইয়া মারিতেছে। না খেতে খেতে শুকায়ে মরছে, শেষ পর্যন্ত না খাওয়ার ফলে বা অখাদ্য খাওয়ার ফলে কোনো একটি ব্যারাম হয়ে মরছে, বলে কিনা আল্লা ডাক দিয়েছে আর রাখবে কে?" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১১০)

ধর্মীয় অপব্যাখ্যা

ধর্ম হচ্ছে এমন একটি হাতিয়ার, যা ব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে দিয়ে বড় কোন উদ্দেশ্য হাসিল করা যায়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন কিংবা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে ধর্মকে ব্যবহার করার নজির বহু পুরোনো। এরই ধারাবাহিকতায় পাকিস্তান শাসনামলেও নীতি বিবর্জিত রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্রীয় শাসকবর্গ ধর্মের কথা বলে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, অনাহার-দুর্ভিক্ষকে ঢেকে রাখত। বলা হতো যে, এগুলো মানুষের ওপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে গজব। আর এভাবেই পাকিস্তানি জালিম শাহী সরকার রাষ্ট্রের কর্তব্য ও নিজেদের ব্যর্থতাকে আড়াল করে রাখত। কিন্তু সাধারণ জনগণের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রের এরূপ অবহেলাকে ক্ষমা করতে পারেননি। তিনি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

২০শে জুন ১৯৬৬ ॥ সোমবার

"কই গ্রেট ব্রিটেনে তো কেউ না খেয়ে মরতে পারে না। রাশিয়ায় তো বেকার নাই, সেখানে তো কেহ না খেয়ে থাকে না, বা জার্মানি, আমেরিকা, জাপান এই সকল দেশে তো কেহ শোনে নাই– কলেরা হয়ে কেহ মারা গেছে? কলেরা তো এসব দেশে হয় না। আমার দেশে কলেরায় এত লোক মারা যায় কেন? ওসব দেশে মুসলমান নাই বললেই চলে। সেখানে আল্লাহ্‌র নাম লইবার লোক নাই একজনও; সেখানে আল্লাহ্‌র গজব পড়ে না। কলেরা, বসন্ত, কালাজ্বরও হয় না।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১১০)

আজান ও নামাজের উল্লেখ

বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন খাঁটি মুসলিম। এজন্য তাঁর বিভিন্ন লিখনীতে ইসলাম ও ইসলামের বিভিন্ন ইবাদতের কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এসকল লিখনী দ্বারা ইসলামের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার বিষয়টি প্রতীয়মান হয়। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

২০শে জুন ১৯৬৬ ॥ সোমবার

"আর আমরা রোজ আল্লাহ্‌র পথে আজান দিই, নামাজ পড়ি, আমাদের ওপর গজব আসে কেন? একটা লোক না খেয়ে থাকলে ঐ সকল দেশের সরকারকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়। আর আমার দেশের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক দিনের পর দিন না খেয়ে পড়ে আছে, সরকারের কোনো কর্তব্য আছে বলে মনেই করে না।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১১০)

গুজব না রটানো

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ধারাবাহিক বন্যার বিরুদ্ধে পাকিস্তানি শাসকরা কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তাদের কাজ ছিল, বন্যা এলেই আল্লাহ্‌র গজব বলে রটনা করা। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে তারা মরুভূমিতেও পানির ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। পূর্ব পাকিস্তানের গরিব মানুষের ট্যাক্সের টাকায় বড় বড় প্রাসাদ তৈরি করেছিল। সেসব রটনার বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু জেলের বাইরে যেমন প্রতিবাদ করেছেন, তেমনি জেলের ভেতরেও প্রতিবাদ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

২০শে জুন ১৯৬৬ ॥ সোমবার

"আমাদের দেশের সরকার বন্যা এলেই বলে 'আল্লাহর গজব'। কিছু টাকা দান করে। কিছু খয়রাতি সাহায্য ও ঋণ দিয়ে খবরের কাগজে ছেপে ধন্য হয়ে যায়। মানুষ এভাবে কতকাল চলতে পারবে সে দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। বড় লোকদের রক্ষা করার জন্যই যেন আইন, বড়লোকদের আরও বড় করার জন্যই মনে হয় সিপাহি বাহিনী। এই দেশের গরিবের ট্যাক্সের টাকা দিয়েই আজ বড় বড় প্রাসাদ হচ্ছে, আর তারা দু'বেলা ভাত পায় না। লেখাপড়া, চিকিৎসা ও থাকার ব্যবস্থা ছেড়েই দিলাম। বন্যায় শত শত কোটি টাকার জাতীয় সম্পদ নষ্ট হয়ে যাইতেছে প্রত্যেক বৎসর। সেদিকে কারও কোনো কর্তব্য আছে বলে মনে হয় না।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১১০-১১১)

পাকিস্তানিদের প্রচারণার নমুনা ছিল এ রকম- বন্যা, দুর্ভিক্ষ হলেই বলে বেড়াত 'এটা আল্লাহ্‌র গজব, আল্লাহ্‌ই এটা দিয়েছেন, আল্লাহ্‌ বান্দার ওপর পরীক্ষা নিচ্ছেন ইত্যাদি। মানুষ যেন সবর করে'। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান স্বয়ং এ রকম প্রচারণা চালাতেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

২৯শে জুন ১৯৬৬ ॥ বুধবার

"বন্যায় দেশের খুবই ক্ষতি হয়েছে। চাউল তেল ও অন্যান্য জিনিসের দাম বেড়েই চলেছে। মোনায়েম খান সাহেবের বক্তৃতায় পেট ভরে যাবে সকলের। তিনি বলেন, 'আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বন্যা হয়েছে। কষ্টের ভিতর দিয়ে খোদা লোককে পরীক্ষা করে থাকেন'। কি আর বলা যায়! বন্যা কন্ট্রোল করতে পারে আজকাল দুনিয়াতে। অনেক দেশে করেছেও। একটু চক্ষু খুলে দেখলে ভাল হয়। ভদ্রলোকের দোষ কি? কিই-বা জানেন আর কিই-বা বলবেন।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১৩৩)

বিশ্বাসঘাতকতার নিন্দা

ব্রিটিশ শাসনামল থেকে শুরু করে পাকিস্তানি শাসনামল এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশেও কিছুসংখ্যক বেঈমান ও বিশ্বাসঘাতকদের কারণে সোনার বাংলা বারবার পিছিয়ে পড়েছে। মাতৃভাষা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামেও এসকল বেঈমান ও বিশ্বাসঘাতকরা গভীর ষড়যন্ত্র করে গেছে। এ সম্পর্কে দুঃখ করে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

২০শে জুন ১৯৬৬ ॥ সোমবার

"বাংলাদেশ শুধু কিছু বেঈমান ও বিশ্বাসঘাতকদের জন্যই সারাজীবন দুঃখ ভোগ করল। আমরা সাধারণত মীর জাফর আলি খাঁর কথাই বলে থাকি। কিন্তু এর পূর্বেও ১৫৭৬ সালে বাংলার স্বাধীন রাজা ছিল দাউদ কারানী। দাউদ কারানীর উজির শ্রীহরি বিক্রম-আদিত্য এবং সেনাপতি কাদলু লোহানী বেঈমানি করে মোগলদের দলে যোগদান করে। রাজমাবাদের যুদ্ধে দাউদ কারানীকে পরাজিত, বন্দি ও হত্যা করে বাংলাদেশ মোগলদের হাতে তুলে দেয়। এরপরও বহু বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এই বাঙালি জাত। একে অন্যের সাথে গোলমাল করে বিদেশি প্রভুকে ডেকে এনেছে লোভের বশবর্তী হয়ে। মীরজাফর আনলো ইংরেজকে, সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করল বিশ্বাসঘাতকতা করে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই বাঙালিরাই প্রথম জীবন দিয়ে সংগ্রাম শুরু করে; সিপাহি বিদ্রোহ শুরু হয় ব্যারাকপুর থেকে। আবার বাংলাদেশে লোকের অভাব হয় না ইংরেজদের সাহায্য করবার। ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত এই মাটির ছেলেদের ধরিয়ে দিয়ে ফাঁসি দিয়েছে এদেশের লোকেরাই– সামান্য টাকা বা প্রমোশনের জন্য।

পাকিস্তান হওয়ার পরেও দালালি করার লোকের অভাব হলো না– যারা সব কিছুই পশ্চিম পাকিস্তানে দিয়ে দিচ্ছে সামান্য লোভে। বাংলার স্বার্থ রক্ষার জন্য যারা সংগ্রাম করছে তাদের বুকে গুলি করতে বা কারাগারে বন্দি করতে এই দেশে সেই বিশ্বাসঘাতকদের অভাব হয় নাই।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১১২)

অন্যত্র বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

৩-৭ এপ্রিল ১৯৬৭

"পূর্ব বাংলার মাটিকে বিশ্বাসঘাতক অনেক পয়দা হয়েছে, আরও হবে, এদের সংখ্যাও কম না। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের স্থান কোথায় এরা দেখেও দেখে না! বিশেষ করে একদল বুদ্ধিজীবী যেভাবে পূর্ব বাংলার

সাথে বেঈমানী করছে তা দেখে আশ্চর্য হতে হয়।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২১৫)

আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ

কারাগারে থাকাবস্থায় বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন রকম সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন। এসব সমস্যা রাষ্ট্র কর্তৃকই সৃষ্টি করা হতো। সুস্থ কয়েদিরা যাতে রাতে আরামে ঘুমাতে না পারে সেজন্য অতিরিক্ত জুলুম হিসেবে পাগল শ্রেণির মানুষ এনে ছেড়ে দেওয়া হতো। এ সময় বঙ্গবন্ধু যিকির-আযকারে সময় অতিবাহিত করতেন। এ রকমই একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন বঙ্গবন্ধু:

২০শে জুন ১৯৬৬ ॥ সোমবার

"আজ আর ঘুমাতে পারলাম না। মেহেরবানি করে একটা পাগল ক্ষেপে গিয়ে চীৎকার করা শুরু করেছে। দিনের বেলা হলে একটা বন্দোবস্ত হতো, পাগলা সেলের অন্যপাশেও সেল আছে। কিন্তু রাতে কোনো উপায় নাই। তাই আল্লাহ আল্লাহ করে রাতটা কাটাতে হলো।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১১২)

অশ্লীলতার বিরোধিতা

সকল প্রকার অশ্লীলতা ও অশ্লীল কর্মকে বঙ্গবন্ধু অপছন্দ করতেন। শুধু তাই নয়, বরং সমাজ থেকে অশ্লীলতা দূরীকরণে তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

২৫শে জুন ১৯৬৬ ॥ শনিবার

"ছেলে ও মেয়ে একে অন্যকে পছন্দ করে বিবাহ করুক তাতে আপত্তি নাই, তবে উচ্ছৃঙ্খলতা এসে গেলে সমাজ ধ্বংস হতে বাধ্য। দেখা গেছে এমন অনেক হয়েছে শেষ পর্যন্ত সুখী হতে না পেরে অনেক অঘটন ঘটেছে। তাই আজকাল দেখবেন আমাদের সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। যার পরিণাম ভাল হয় না। শুরুও হয়ে গেছে এ দেশে এর ফলাফল। নারী শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে, নারী শিক্ষিত না হলে দেশের মুক্তি আসতে পারে না। কিন্তু শিক্ষার নামে যে নির্লজ্জতা বেড়ে যেতেছে এদিকেও সমাজের নজর দেয়া উচিত।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১২৩)

ক্ষমাশীলতা

বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে ক্ষমাশীলতার গুণটি ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিল। তিনি নিজ শত্রুদেরকেও ক্ষমা করে দিতে কোনরূপ দ্বিধা করতেন না। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

২৬শে জুন ১৯৬৬ ॥ রবিবার

"পুরান ২০ সেলে তাকে বললাম দূর থেকে, 'ভেব না ভাই। আমাকেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাহির করে দিয়েছিল। যারা বাহির করে দিয়েছেন তাদের অনেকেই আমার কাছে এসেছিলেন। ক্ষমা করে দিয়েছিলাম– পরে শোধ নিতে পারতাম, নেই নাই। খোদার উপর নির্ভর করো।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১২৮)

পরোপকারিতা

অপরের বিপদাপদে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা একটি মহৎ ও উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ইসলামে এ ব্যাপারে বহু নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)ও সর্বদা অপরের সহযোগিতায় নিয়োজিত থাকতেন। এক্ষেত্রে বাঙালি জাতির নেতা বঙ্গবন্ধুও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনিও সাধ্যমত সর্বদা অন্যের সহযোগিতায় নিজের হাত প্রসারিত করে দিয়েছেন। এমনকি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ গুণটি তাঁর মধ্যে বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

২৬শে জুন ১৯৬৬ ॥ রবিবার

"খাজা মহিউদ্দিন যে কি খেয়ে পরীক্ষা দিবে তাই ভাবলাম। ডিপুটি জেলার সাহেবকে বললাম, একটু খেয়াল রাখবেন ছেলেটার দিকে। আমার কাছে তো কিছু কিছু জিনিস আছে কিন্তু দেবার তো হুকুম নাই। তবুও ভাবলাম, বেআইনি হলেও আমাকে কিছু দিতে হবে। দেখা হয়েছিল। আমার সেলের কাছ দিয়ে যেতে হয়। আমি এগিয়ে যেয়ে ওকে আদর করে বললাম, 'ভেব না, তুমি পাশ করবা। মাথা ঠাণ্ডা করে লেখবা।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১২৮)

ঈদে মিলাদুন্নবী

সুদীর্ঘকাল থেকে বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) দিবস পালন করে আসছেন। দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করত দিনটিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে পালন করা হয়। কারাগারে থাকাকালীন এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

২রা জুলাই ১৯৬৬ ॥ শনিবার

"আজ মিলাদুন্নবী। জেলখানায় কয়েদিদের ছুটি। বড় বড় কর্মচারীদেরও ছুটি। বড় সাহেবদের আগমন বার্তা নিয়ে কয়েদিরা আজ আর হৈ চৈ করছে না। কয়েকজন লোক নিয়ে আমার ফুলের বাগানের আগাছাগুলি তুলে ফেলতে শুরু করলাম।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১৩৯)

বদ দোয়া

মজলুমের বদদোয়া সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। শুধু তাই নয়, জেলের ভেতরে থাকাবস্থায়ও তিনি অন্যদেরকে মজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকার জন্য নসিহত প্রদান করতেন। এমনকি স্বয়ং জেলারকেও তিনি নসিহত করেছিলেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

৪ঠা জুলাই ১৯৬৬ ॥ সোমবার

"জেলার সাহেব এলেন। তাঁকে বললাম, আপনার জেলে সাধারণ কয়েদিদের উপর জুলুম চলেছে, খাওয়া-দাওয়াও ভাল হইতেছে না। আশা করি আপনি খেয়াল রাখবেন। বদনাম আপনাকেই মানুষ করবে। আর বদ দোয়াও করবে আপনাকে। জেলার সাহেব কয়েদিদের উপর নিজে কোনো অত্যাচার করেন না, সে আমি জানি।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১৪৬)

দাজ্জাল, ইমাম মাহদি ও ইয়াজূজ-মাজূজ

বঙ্গবন্ধু অনেক সময় জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দ্বীনি আলোচনা করতেন। এমনকি ডিআইজি সাহেবের সাথেও কুরআন-হাদীস নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত হতেন। এমন অনেক ঘটনা রয়েছে তাঁর ডায়েরির পাতায় পাতায়। একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁরা কিয়ামতের বিভিন্ন আলামত তথা দাজ্জাল, ইমাম মাহদি ও ইয়াজূজ-মাজূজ সম্পর্কেও আলোচনা করেছিলেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

৭ই জুলাই ১৯৬৬ ॥ বৃহস্পতিবার

"১১টার সময় ডিআইজি জনাব ওবায়দুল্লা দেখতে এসেছেন সেল এরিয়ায়। আমার কাছে আসলে তিনি দুই চার মিনিট বসেন। আজ অনেকক্ষণ বসলেন। হাদিস শরীফ নিয়ে আলোচনা করলেন। খানে দাজ্জাল ইমাম মেহেদী আসবেন। ঈসা নবীও আর একবার আসবেন। এজ্জাজ, মাজুজও হাজির হবে। দুনিয়া প্রায়ই ধ্বংস হয়ে যাবে– আরও অনেক কিছু বলেন। আমিও দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌র জন্মের ১৪ শত বছর পর দুনিয়ায় কি হয় বলা কষ্টকর। তিনি যখন উঠলেন তখন আমি বললাম খানে দাজ্জাল তো

দুনিয়ায় এসেছে, ইমাম মেহেদীর খবর কি? তিনি বুঝলেন আমি কাকে ইঙ্গিত করলাম। হেসে দিয়ে বিদায় নিলেন, কোনো কথা আর বললেন না।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১৫১)

জালেমকে ক্ষমা করা দুর্বলতার লক্ষণ

জুলুমের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ ছিল সর্বদা প্রতিবাদী। এমনকি কারাগারের ভেতরে বসেও তিনি জালিমের জুলুমের নিন্দা করেছেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

৮ই জুলাই ১৯৬৬ ॥ শুক্রবার

"মনকে শক্ত করতে আমার কিছু সময় লাগল। ভাবলাম সকল সময় ক্ষমা করা উচিত না। ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ, কিন্তু জালেমকে ক্ষমা করা দুর্বলতারই লক্ষণ।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১৫২)

কিসাস প্রসঙ্গ

ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু অবহিত ছিলেন। এজন্যই তো আমরা তাঁর বিভিন্ন লিখনীতে ইসলামী আইনের উল্লেখ দেখতে পাই। এমনকি ইসলামী শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান তথা কিসাস সম্পর্কেও বঙ্গবন্ধু তাঁর গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

৮ই জুলাই ১৯৬৬ ॥ শুক্রবার

"ইসলামে ঠিক কথাই বলেছে, 'ক্ষমা করতে পার ভাল না করতে পারলে, হাতের পরিবর্তে হাত, চক্ষুর পরিবর্তে চক্ষু নিতে আপত্তি নাই।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১৫২)

জেয়াফত-মিলাদ প্রসঙ্গ

বঙ্গবন্ধু তাঁর বাল্যকাল গ্রামে অতিবাহিত করেন। এজন্য বলা যায় যে, তিনি ছিলেন গ্রামের একজন জাত সন্তান। ফলে গ্রামের লোকসংস্কৃতি আর লোকধর্মের

প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল সহজাত। তাই কারাগারে থাকাবস্থায়ও এসকল বিষয়ের কথা তাঁর নিরন্তর মনে পড়ত। তিনি তাঁর লিখনীতে গ্রাম্য সংস্কৃতির পাশাপাশি ইসলামী বিভিন্ন অনুষ্ঠান তথা জেয়াফত, মিলাদ মাহফিল প্রভৃতি বিষয়াদি উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

৮ই জুলাই ১৯৬৬ ॥ শুক্রবার

"চুপ করে শুয়ে চিন্তা করতে লাগলাম গ্রামের কথা, বস্তির কথা। গ্রামে গ্রামে আনন্দ ছিল, গান-বাজনা ছিল, জেয়াফত হতো, লাঠি খেলা হতো, মিলাদ মাহফিল হতো। আজ আর গ্রামের কিছুই নাই। মনে হয় যেন মৃত্যুর করাল ছায়া আস্তে আস্তে গ্রামগুলিকে প্রায় গ্রাস করে নিয়ে চলেছে।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১৫৩)

ধর্মীয় অপরাজনীতি

বঙ্গবন্ধু ধর্মের নামে অপরাজনীতিকে পছন্দ করতেন না। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নিজেদের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করতে ইসলাম ধর্মকে পুঁজি করে অপরাজনীতিতে মেতে উঠেছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বে পাকিস্তানি শাসক ও শোষণের দিনগুলো কীভাবে ধর্মীয় উন্মাদনার মাধ্যমে অতিবাহিত হচ্ছিল তার পর্যবেক্ষণ বঙ্গবন্ধু কারাগারে বসে করেছেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

১২ই জুলাই ১৯৬৬ ॥ মঙ্গলবার

"কিছু তথাকথিত মুসলিম লীগের নেতারা এক ঈমান, এক রাষ্ট্র, এক মুসলমান, এক দেশ, এক নেতা বলে সর্বক্ষণ গলা ফাটাচ্ছে। আবার কেহ কেহ বাঙালি মুসলমানদের পাকিস্তানের উপর আনুগত্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেহ কেহ মুরব্বিয়ানাচালে দেশপ্রেমিকের সার্টিফিকেটও দিয়ে থাকেন। দুনিয়ায় নাকি পাকিস্তানের সম্মান এতো বেড়ে গেছে যে আসমান প্রায় ধরে ফেলেছে।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১৫৮)

ইসলামী রিপাবলিকে ইসলামী আদর্শের নমুনা

রাষ্ট্রের ঘুষ, অত্যাচার, জুলুম, বেইনসাফি, মিথ্যাচার, শোষণ প্রভৃতি মন্দ বিষয়সমূহের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু বরাবরই প্রতিবাদী ছিলেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

১৪ই জুলাই ১৯৬৬ ॥ বৃহস্পতিবার

"আজ ঢাকা জেলের ডিআইজি সাহেব কয়েদিদের দেখতে ভিতরে এসেছিলেন। আমাকেও দেখতে এসেছিলেন, কিছু সময় বসেছিলেনও। ধর্মকথা আলোচনা করলেন। বললাম, ইসলামের কথা আলোচনা করে কি লাভ? পাকিস্তানের নাম তো ইসলামিক রিপাবলিক রাখা হয়েছে।

দেখুন তো 'ইসলামের' আদর্শ চারিদিকে কায়েমের ধাক্কায় ঘুষ, অত্যাচার, জুলুম, বেইনসাফি, মিথ্যাচার, শোষণ এমনভাবে বেড়ে চলেছে যে যারা আল্লাহয় বিশ্বাস করে না, তারাও নিশ্চয়ই হাসবে আমাদের অবস্থা দেখে। দেখুন না রাশিয়ায় যেখানে ধর্ম বিশ্বাস করে না সেখানে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চেষ্টা করছে, ঘুষ, শোষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মানুষের বাঁচবার অধিকার স্বীকার করেছে।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১৬২)

সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা

বঙ্গবন্ধু কোনদিন সন্ত্রাসবাদের রাজনীতি করেননি। কোনরূপ সন্ত্রাসবাদের রাজনীতিকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। কেননা তিনি রাজনীতি করেছেন জনগণের অধিকার আদায় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নিজ অবস্থান ব্যক্ত করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

২৭শে জুলাই ১৯৬৬ ॥ বুধবার

"আমি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। যদি ঐ পথে কাজ করতে না পারি ছেড়ে দিব রাজনীতি। প্রয়োজন কি! আমরা একলা দেশসেবার মনোপলি নিই নাই। যারা সন্ত্রাসবাদীতে বিশ্বাস করে তারাই একমাত্র রাজনীতি করবে, মাটির তলা থেকে ধাক্কা দিবে সুযোগ পেলেই। আমার কি আসে যায়? বহুদিন রাজনীতি করলাম। এখন ছেলেমেয়ে নিয়ে আরাম করব। তবে সরকার যেভাবে জুলুম চালাচ্ছে তাতে রাজনীতি কোনদিকে মোড় নেয় বোঝা কষ্টকর।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১৮২)

আল্লাহ্‌র প্রতি তাওয়াক্কুল

পাকিস্তানি শাসকদের কর্তৃক অত্যাচার-নির্যাতন এবং বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি একনিষ্ঠভাবে

তাওয়াক্কুল বা ভরসা করতেন। ফলে জালিমের কোন প্রকার জুলুমই তাঁকে ন্যায় ও সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। এজন্যই বঙ্গবন্ধুর জীবনী পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, যে ধরনের 'স্ট্রিম রোলার' তাঁর ওপর দিনের পর দিন চালানো হয়েছিল, তাতে তাঁর বেঁচে থাকার কথা নয়। সে জন্য তাঁর অশেষ শোকরিয়া ছিল আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি। সেসব কৃতজ্ঞতার কথা তিনি বিভিন্ন জায়গায় লিখেছেন, কারাগারের ডায়েরিতেও আছে এমন অনেক মন্তব্য। এমনই একটি ঘটনা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

২৭শে জুলাই ১৯৬৬ ॥ বুধবার

"শুনলাম, আমার বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, ঢাকা সব জায়গাতেই মামলা দায়ের করছে। আমি একা এত মামলা সামলাব কেমন করে? আমি ভাসাইয়া দিয়াছি নিজেকে যাহা হবার হবে। খোদাই আমাকে রক্ষা করেছে জালেমদের হাত থেকে, আর ভবিষ্যতেও করবে।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১৮২)

বঙ্গবন্ধুর সহ্যশক্তি ছিল অত্যধিক। এজন্য তিনি সবসময় আল্লাহ্র কাছে শোকরিয়া আদায় করেছেন। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁর ধৈর্যের ক্ষমতা ছিল নাগালের বাইরে, তা হলো পিতা-মাতার দুঃখ-কষ্ট। এ সময়ও আমরা দেখতে পাই তিনি আল্লাহ্ তা'আলার ওপর ভরসা করেছেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

৩-৭ এপ্রিল ১৯৬৭

"খোদা আমাকে যথেষ্ট সহ্য শক্তি দিয়েছে, কিন্তু আমার আব্বা-মার অসুস্থতার কথা শুনলে আমি পাগল হয়ে যাই, কিছুই ভাল লাগে না। খেতেও পারি না, ঘুমাতেও পারি না। তারপর আবার কারাগারে বন্দি। আমি কারাগারে বন্দি অবস্থায় যদি আমার বাবা বা মায়ের কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তবে সহ্য করতে পারব কিনা জানি না।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২১৫-২১৬)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ঢাকার কুর্মিটোলা সেনানিবাসে অন্তরীণ করা হয়। এ সময়ও তিনি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার ওপর ভরসা করেছিলেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

"আমিও কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করি না। এই মেসে আর কোনো বন্দি আছে কিনা বুঝতে পারছি না। দরজাটা সকলেরই বন্ধ। এই কামরাটার খবর ছাড়া কিছুই জানি না। কারো কোনো চিঠি পাই না। রেণু ছেলেমেয়ে নিয়ে কি অবস্থায় আছে? আব্বা মা ভাই বোন

কোথায় কি করছে, কেমন আছে? এমনিভাবে একাকী দিন কাটছে। কোনো খবর নাই। শরীরও দিন দিন খারাপ হইতেছে। একদিন একজন কর্মচারী বলল, দিনভর বসে আর শুয়ে থাকবেন না, ঘরের ভিতর যে জায়গাটুকু আছে সেখানে হাঁটাচলা করুন। কথাটা আমার মনে ধরল। যদিও ছোট্ট কামরা, ৩ ঘণ্টা সকালে দুপুরে বিকালে আপন মনে হাঁটতাম। খোদা ছাড়া কেইবা সাহায্য করতে পারে! দেশের কোথায় কি হতেছে? দুনিয়ায় কি ঘটছে? কোনো কিছুর খবর নাই।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২৪৬)

পাকিস্তানি জালিম শাহী কর্তৃক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামিদের উপর যে ভয়াবহ নির্যাতন নেমে এসেছিল তা ছিল অবর্ণনীয়। এরকম জুলুম-নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার ওপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করার জন্য বঙ্গবন্ধু নসিহত প্রদান করতেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

"প্রথম খবর পাই জেলের মধ্যে ঈদের নামাজে। এই দিন বিভিন্ন ওয়ার্ডের বন্দিরা কিছু সময়ের জন্য এক জায়গায় নামাজ পড়তে জমা হয়। আমাকে দেখে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ কর্মী কেঁদে ফেলে এবং বলে তাকে ২১ দিন পুলিশ কাস্টডিতে রেখেছিল। মেরে পা ভেঙে দিয়েছে। তারপর রাজারবাগ পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসা করে একটু আরোগ্য লাভ করলে জেলে পাঠাইয়া দিয়েছে। আমাকে জড়াইয়া ধরে কেঁদে দিয়ে বলল, শুধু আপনার নাম বলবার জন্য আমাকে এত মেরেছে, সহ্য করতে পারি নাই বলে যাহা বলেছে তাহাই লিখে দিয়ে এসেছি। আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম আর বললাম, আল্লাহ্র উপর নির্ভর কর। যাহা হবার হবেই। আমাকে বলল, সরকারের কাছে দরখাস্ত করব।

... আমার সাথে দেখা করতে এসে রেণু (আমার স্ত্রী) আমাকে বলেছিল, তোমাকে জড়াবার চেষ্টা হইতেছে। জানি না খোদা কি করে। আল্লার উপর নির্ভর কর।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২৫২-২৫৩)

আল্লাহ্র ওপর অসীম ভরসা ও শোকরিয়ার ওপরই বঙ্গবন্ধু কারাগারের দিনগুলো অতিবাহিত করেছেন। আল্লাহ্র প্রতি ছিল তাঁর একান্ত বিশ্বাস ও অসীম নির্ভরতা। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

"বিদায় নিবার সময় মোমিন সাহেবকে বললাম, বোধ হয় আর আপনাদের সাথে দেখা হবে না। আপনারা রইলেন এদেশের মানুষের জন্য, আমি চললাম। খোদা আপনাদের সহায় আছেন।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২৫৪-২৫৫)

পাকিস্তানি জালিম শাসক আইয়ুব-মোনায়েম খানের জেল-জুলুমের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন বঙ্গবন্ধুর মনোবল অটুট ছিল একমাত্র খোদাভীতি ও খোদার রহমতের আশায়। এককথায় জালেমের জুলুম-নির্যাতন থেকে তিনি এভাবেই রক্ষা পেয়েছিলেন। ঢাকা সেনানিবাসের বন্দিখানায় তাঁর দিনগুলোর একটি চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন এভাবে:

"কামরার সামনে একজন রাইফেলধারী সিপাহি ও পিছনে একজন দাঁড়াইয়া আছে সর্বক্ষণের জন্য। মিলিটারি কাস্টড়ি কাকে বলে পূর্বে ধারণা ছিল না। প্রথম দিন এইভাবে কেটে গেল। পরের দিন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এলেন আমার কামরায়। তাকে আমি জানি না। তিনি আমাকে বললেন, কোনো অসুবিধা আছে কিনা? বললাম, জানলাটা খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন, না হলে স্বাস্থ্য ঠিক থাকবে কি করে? তিনি জানলা খুলে দিতে হুকুম দিয়ে চলে গেলেন। আমি সেই অন্ধকার কামরায় বসে বসে খোদাকে ডাকা ছাড়া আর কি করতে পারি!" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২৫৯)

রাসূলের (সা) নীতি বিরোধী কর্মকাণ্ড না করা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুমহান আদর্শ সকল মুসলমানের জন্য অবশ্যই অনুসরণীয়। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ইসলামের দোহাই দিয়ে সর্বদা রাসূল (সা)-এর নীতি বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল। শাসকগোষ্ঠীর এরকম কার্যকলাপ সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয় বলে বঙ্গবন্ধু মনে করতেন। পাকিস্তান শাসনামলে নবী করীম (সা)-এর আদর্শকে বাহানা করে কেমন করে শাসন-শোষণ চলত তার একটি বিবরণ রয়েছে বঙ্গবন্ধুর ডায়েরিতে। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন,

২রা আগস্ট ১৯৬৬ ॥ মঙ্গলবার

"জনাব আইয়ুব খান সাহেব আজকাল আল্লাহ ও রাসুলের নাম নিতে শুরু করেছেন। খুব ভাল কথা। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বলেন, 'দেশের দুই অংশকে যুক্ত করার সূত্র আমাদের পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মহান ব্যক্তিত্বেই পরিলক্ষিত হইয়াছে। যতদিন এই যোগসূত্রের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন জাতীয় একতা অক্ষুণ্ন থাকিবে'। মহান আদর্শের নামে নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ (সা) দেশের একটা অংশ অন্য অংশকে শোষণ করবে এ কথা বলে যান নাই। তিনি তো ইনসাফ করতে বলেছিলেন। শোষক ও শোষিতের মধ্যে সংগ্রাম হয়েই থাকে এবং হবেও। শোষকদের কোনো জাত নাই, ধর্ম নাই। একই ধর্মের

বিশ্বাসী লোকদেরও শোষণ করে চলেছে ছলে বলে কৌশলে।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১৮৭)

অধীনস্থদের অধিকার আদায়

বঙ্গবন্ধু ছিলেন উদার মনমানসিকতার অধিকারী, অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি সকল মানুষকে সমভাবে সম্মান করতেন। মানুষের মধ্যে কোনরূপ বিভেদ বা পার্থক্য করা তিনি পছন্দ করতেন না। এজন্যই তো ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার আদায়ে তিনি সোচ্চার ছিলেন। তিনি তাঁর বাড়ির কাজের লোক, দারোয়ান, ড্রাইভার ও অন্যান্য অধীনস্থদেরকে নিজের পরিবারের সদস্য হিসেবে মূল্যায়ন করতেন। এমনকি কারাগারে অন্তরীণ থাকাকালেও অধীনস্থদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আচরণ কীরূপ ছিল তাঁর নিম্নোক্ত লিখনীর মাধ্যমে তা আমরা জানতে পারি। তিনি লিখেছেন,

৪ঠা আগস্ট ১৯৬৬ ॥ বৃহস্পতিবার

"রেণু কিছু খাবার দিয়ে গেছে– কি করে একলা খেতে পারি? কই মাছ খেতে আমি ভালোবাসতাম, তাই ভেজে দিয়েছে। কয়েকটা মাছ পাকিয়ে দিয়েছে, মুরগির রোস্ট এগুলি খাবে কে? কিছু কিছু খেয়ে বিলিয়ে দিলাম কয়েদিদের মধ্যে। তারা কত খুশি এই জিনিস খেয়ে! কেহ বলে, সাত বৎসর কেহ বা পাঁচ বৎসর কেহ বা তিন বৎসর এই জেলে একঘেয়ে খাওয়া খেয়ে বেঁচে আছে। যখন মিঠা কুমড়া শুরু হয় কয়েক মাস মিঠা কুমড়াই চলে, আবার যখন ক্ষেত্রে ডাঁটা জন্মায় আবার শুরু হয়ে কিছুদিন চলে, আবার কিছুদিন পুঁইশাক। ডাল তো আছেই। আমার এক ছাফাইয়া ছিল একটু রসিক, সাত বৎসর জেল হয়েছে, প্রায় পাঁচ বৎসর খেটেছে বলে খালাসের সময় হয়ে এসেছে। বলে, এই রকম মজার খাবার পেলে আর কিছুদিন জেলে থাকতে রাজি আছি। মেট বলে, 'পেটে ডালের চর পড়ে গিয়াছিল। বিশ বৎসর সাজা, সাত বৎসর খেটেছি এখন আর ডাল খেতে হয় না।'

আমি যাহা খাই ওদের না দিয়ে খাই না। আমার বাড়িতেও একই নিয়ম। জেলখানায় আমার জন্য কাজ করবে, আমার জন্য পাক করবে, আমার সাথে এক পাক খাবে না! আজ নতুন নতুন শিল্পপতিদের ও ব্যবসায়ীদের বাড়িতেও দুই পাক হয়। সাহেবদের জন্য আলাদা, চাকরদের জন্য আলাদা। আমাদের দেশে যখন একচেটিয়া সামন্তবাদ ছিল, তখনও জমিদার তালুকদারদের বাড়িতেও এই ব্যবস্থা ছিল না। আজ যখন সামন্ততন্ত্রের কবরের উপর শিল্প ও বাণিজ্য সভ্যতার সৌধ

গড়ে উঠতে শুরু করেছে তখনই এই রকম মানসিক পরিবর্তনও শুরু হয়েছে, সামন্ততন্ত্রের শোষণের চেয়েও এই শোষণ ভয়াবহ।

আমি তো অনেক আরামেই থাকি; কিন্তু সাধারণ কয়েদিদের জীবন তো দুর্বিষহ। কয়েদিরা যেন মেশিন হয়ে গেছে। আমার জন্য যারা কাজ করে তারা ছাড়াও আমার এরিয়ায় যারা কাজ করে তাদের প্রত্যেককেই আমি মাঝে মাঝে কিছু কিছু খেতে দিতে চেষ্টা করি। কিছু কিছু করে জমাই আমার খাবার থেকে, তারপর ডাকাইয়া ওদের মধ্যে বিলি করি। কত আনন্দ দেখি ওদের মুখে।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১৮৯-১৯০)

পাকিস্তানি জেল, দুনিয়ার দোজখ

দীর্ঘদিন বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের জেলে অবস্থান করেছেন। এজন্য পাকিস্তানের জেলের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে তিনি সমধিক অবগত ছিলেন। পাকিস্তানি কারাগারের পরিবেশ ছিল মনুষ্য বাস অনুপযোগী। এজন্য বঙ্গবন্ধু তাঁর লিখনীতে পাকিস্তানী কারাগারকে দুনিয়ার দোজখ হিসেবে অভিহিত করেছেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

৬ই আগস্ট ১৯৬৬ ॥ শনিবার

"সন্ধ্যায় আরও দুই ভদ্রলোককে জেলে আনল, একজন সন্ধ্যার পূর্বে, আর একজন তালাবন্ধ করার পরে। তাদেরও পুরানা ২০ সেলের ৪ নম্বর ব্লকে রাখা হয়েছে। খবর নিয়ে জানলাম একজনের নাম ফজলে আলী, তিন মাস পূর্বে চার্টার্ড একাউনটেন্ট হয়ে বিলাত থেকে এসেছেন। আর একজন আলমগীর কবির, ন'মাস পূর্বে বিলাত থেকে এসেছেন– সাংবাদিক। কি করেছে জানি না, পূর্ব বাংলায় রাজনীতি করে নাই। কোনোদিন করলে নিশ্চয়ই আমি জানতাম। বিলাতে বসে কোনো কিছু করেছে কি না জানি না। বিলাতি কায়দায় কাপড়-চোপড় পরে এসেছে। ভাবলাম, বেচারা কোথায় এসেছে একটু পরেই বুঝতে পারবে। দুনিয়ার দোজখ, পাকিস্তানি জেল। দেড় টাকা খোরাক বাবদ সারাদিন ভরে।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ১৯২)

ঈদ পালনে পাকিস্তানিদের জুলুম

রমজান মাসের রোজা রাখা এবং রোজা শেষ করে ঈদ পালন করা নতুন চাঁদের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ধর্মীয় বিষয়েও রাজনীতি করতে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধ করেনি। এক্ষেত্রেও তারা নগ্ন হস্তক্ষেপ চালিয়েছে। ফলে প্রতিবছর গণ্ডগোল দেখা দিত, যখন পূর্ব পাকিস্তানে চাঁদ না উঠলেও পশ্চিম পাকিস্তানে চাঁদ দেখা গেছে বলে বাঙালিদের তা অনুসরণ করতে বাধ্য করা

হতো। বঙ্গবন্ধুর ডায়েরিতে এ ইতিহাসটাও অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে ওঠেছে, যেখানে ধর্মীয় আমল নিয়েও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর জুলুম করা হতো। এ সম্পর্কে দুঃখ করে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

১২ই জুন ১৯৬৭ ॥ বৃহস্পতিবার

"১২ই জুন সকালবেলা, জেলের মধ্যে ঈদ হবে, কারণ সরকারের হুকুম। অনেক সিপাহি ও জেল কর্মচারী রোজা ভাঙতে রাজি হয় নাই। তবে কয়েদিদের নামাজ পড়তেই হবে, ঈদ করতেই হবে। শুনলাম পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারি লোক চাঁদ দেখেছে। পশ্চিম পাকিস্তানে উন্নতি হলে পূর্ব বাংলায় উন্নতি হয়! হাজার মাইল দূরে পশ্চিম পাকিস্তানে চাঁদ দেখেছে, এখানে নামাজ পড়তেই হবে। আমাদের আবার নামাজ কি! তবুও নামাজে গেলাম, কারণ সহকর্মীদের সাথে দেখা হবে।

... আমার পায়ে ব্যথা, তাই বসে বসেই মিললাম সকলের সাথে। কারাগার থেকেই দেশবাসী ও সহকর্মীদের জানাই ঈদ মোবারক। পূর্ব বাংলার লোক সেইদিনই ঈদের আনন্দ ভোগ করতে পারবে, যেদিন তারা দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে এবং দেশের সত্যিকারের নাগরিক হতে পারবে।

নামাজ আমাদের আজই পড়তে হয়েছে। বাহির থেকে খাওয়া-দাওয়া কিছুই আসে নাই। কারণ বাইরের লোক তো আমাদের মত বন্দি না, তারা ১৩ তারিখেই ঈদ করবে। ১৩ তারিখেই শতকরা ৯০ জন লোক ঈদ করেছে। কিন্তু কারাগারে খাওয়ার বন্দোবস্তও ১২ তারিখেই হয়েছে।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২০১-২০২)

অন্যত্র বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

১৩ই জুন ১৯৬৭ ॥ শুক্রবার

"আজ ১৩ তারিখ খবর পেলাম ঢাকায়ও আজ নামাজ হয়েছে। অনেকেই নামাজ পড়েছে। জেল কর্মচারীরা আজও দেখা করতে এসেছে। তাদের কথা হলো চাকরি করে বলে নামাজও সরকারের ইচ্ছায় পড়বে নাকি?" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২০৩)

ভাষা আন্দোলন

মাতৃভাষা মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার দেয়া নেয়ামত তথা বাংলা ভাষার অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছিল। ফলে ভাষার অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করা বাঙালি জাতির জন্য তখন শুধু রাজনৈতিক দৃষ্টিতেই অপরিহার্য ছিল না; বরং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও অপরিহার্য ছিল। এজন্যই বাঙালির মুক্তির নায়ক বঙ্গবন্ধু মাতৃভাষার অধিকার আদায়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। শুধু তাই নয়,

এজন্য তাঁকে দীর্ঘদিন কারাবরণ করতেও হয়েছিল। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন:

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭ ॥ ৮ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার

"আজ অমর একুশে ফেব্রুয়ারি। ঠিক পনের বছর আগে সেদিন ছিল বাংলা ১৩৫৮ সালের ৮ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ইংরেজি ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করার জন্য শহীদ হয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন বীর সন্তান: ১। আবদুস সালাম, ২। আবদুল জব্বার, ৩। আবুল বরকত, ৪। রফিকউদ্দিন। আহত হয়েছিলেন অনেকেই। ঠিক পনের বৎসর পূর্বে এইদিনে আমিও রাজবন্দি ছিলাম ফরিদপুর জেলে। ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন ধর্মঘট করি। জানুয়ারি মাসে আমাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। সেখানেই ছাত্র নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ করে ১৬ই ফেব্রুয়ারি অনশন করব আর ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলা দিবস পালন করা হবে বলে স্থির হয়। আমাকে আবার জেল হাসপাতালে নিয়ে আসা হলো চিকিৎসা না করে। ১৫ই ফেব্রুয়ারি আমাকে ও মহিউদ্দিনকে ফরিদপুর জেলে চালান দেওয়া হলো। মহিউদ্দিনও আমার সাথে অনশন করবে স্থির করে দরখাস্ত দিয়েছিল। আজ ঠিক পনের বৎসর পরেও এই দিনটাতে আমি কারাগারে বন্দি।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২০৬)

শহীদের রূহের মাগফেরাত

কারাগারে অন্তরীণ থাকাকালেও ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখের শহীদগণকে বঙ্গবন্ধু ভুলে যাননি। বাংলা ভাষার অধিকার আদায়ে যে সকল বীর বাঙালি নিজের জীবন আত্মোৎসর্গ করেছেন, তিনি গভীর শ্রদ্ধাভরে তাঁদেরকে স্মরণ করেছেন। পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাঁদের রূহের মাগফেরাতও কামনা করেছেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭ ॥ ৮ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার

"এইদিন আমাদের কাছে পবিত্র দিন। ... আমি কারাগারের এই ছোট্ট ঘরটি থেকে আমার আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই বাংলার যুব সমাজ ও জনসাধারণকে, আর শহীদদের রূহের মাগফেরাত কামনা করি।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২০৭)

ঈদের দিনে কারাগারের কষ্ট

কারাগারের বন্দি জীবনে ঈদ উদযাপন করা খুবই মর্মান্তিক একটি ব্যাপার। কিন্তু পাকিস্তানি জালিম শাসকদের রোষানলে পড়ে বঙ্গবন্ধুকে তাঁর জীবনের বহু ঈদ কারাগারের চার দেয়ালের মধ্যে কাটাতে হয়েছে। ফলে ঈদের দিন

কারাগারে আবদ্ধ থাকাবস্থায় নিজ স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতার কথা তাঁর খুব মনে পড়ত। কিন্তু তাঁর কিছুই করার ছিল না। তাঁকে দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়েই একাকি ঈদ উদযাপন করতে হতো। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

২২শে মার্চ ১৯৬৭ ॥ বুধবার

"আজ কুরবানির ঈদ। গত ঈদেও জেলে ছিলাম। এবারও জেলে। বন্দি জীবনে ঈদ উদযাপন করা একটি মর্মান্তিক ঘটনা বলা চলে। বার বার আপনজন বন্ধু-বান্ধব, ছেলেমেয়ে, পিতা-মাতার কথা মনে পড়ে।

ঈচ্ছা ছিল না নামাজে যাই। কিইবা হবে যেয়ে, কয়েদিদের কি নামাজ হয়! আমি তো একলা থাকি। আমার সাথে কোনো রাজনৈতিক বন্দিকে থাকতে দেয় না। একাকী কি ঈদ উদযাপন করা যায়? জেলার সাহেব নামাজ বন্ধ করে রেখে আমাকে নিতে আসেন। তাই যেতে বাধ্য হলাম।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২১২-২১৩)

লোভীর নিন্দা

লোভ মানব চরিত্র বিধ্বংসী একটি মন্দ চারিত্রিক গুণ। এরূপ মন্দ বিষয়টিকে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। লোভী ব্যক্তিদের তিনি তিরস্কার করতেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কতিপয় অসাধু ব্যক্তি লোভের বশবর্তী হয়ে নিজ দেশের মানুষের অধিকার খর্ব করে পশ্চিম পাকিস্তানিদের দালালিতে লিপ্ত ছিল। এসকল অসৎ চরিত্রের ব্যক্তিদের সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

৩-৭ এপ্রিল ১৯৬৭

"সামান্য পদের বা অর্থের লোভে পূর্ব বাংলাকে যেভাবে শোষণ করার সুযোগ দিতেছে দুনিয়ার অন্য কোথাও এটা দেখা যায় না। ছয় কোটি লোক আজ আস্তে আস্তে ভিখারি হতে চলেছে। এরা এদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কথাও চিন্তা করে না।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২১৫)

পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ইসলামের ন্যায় আধুনিক গণতন্ত্রেও পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ তথা অন্যের মতামতকে গুরুত্ব প্রদান করা অপরিহার্য একটি বিষয়। আর বঙ্গবন্ধুও সর্বদা অন্যের মতামত বা পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করাকে পছন্দ করতেন। নিজের মতকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়াকে তিনি অপছন্দ করতেন। তিনি সর্বদা সকলের মতামতের ভিত্তিতে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

২২শে এপ্রিল ১৯৬৭ ॥ শনিবার

"আমি আমার মতামত দেই নাই কারণ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা নিজেরাই আলোচনা করে তাদের পথ ঠিক করুক। আমি আমার মত চাপাইয়া দিতে যাবো কেন?" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২২৬)

আল্লাহ্‌র মহিমা

আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি বঙ্গবন্ধুর অগাধ ও গভীর বিশ্বাস ছিল। তিনি সর্বদা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীর সকল বিষয়াদি আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত। ১৯৬২ সালের ২৭শে এপ্রিল লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনকারী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ইন্তেকাল করেছিলেন। এ সময় বঙ্গবন্ধু কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। অতঃপর দীর্ঘ পাঁচ বছর পর ১৯৬৭ সালে ২৭শে এপ্রিলও তিনি কারাগারেই আছেন। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

২৭শে এপ্রিল ১৯৬৭ ॥ বৃহস্পতিবার

"আজ লাহোর প্রস্তাবের মালিকের মৃত্যুবার্ষিকী। আর লাহোর প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে আমি যে ৬ দফা দাবি পেশ করেছি তার উপর বক্তৃতা করার জন্য এ দিনটিতে আমাকে ১৫ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হলো। আল্লাহ্‌র মহিমা বোঝা কষ্টকর।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২৩২)

সাধারণ মানুষের ভালোবাসা

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাংলার স্বাধীনতাকামী জনগণের আশা-ভরসার প্রতীক। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ তথা সর্বাবস্থায় তিনি তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এজন্যই তারা তাঁকে নিজ জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসত। তাঁর প্রতি জনগণের ভালোবাসা ছিল অতুলনীয়। এমনকি কারাগারের কয়েদিরাও বঙ্গবন্ধুর প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা প্রদর্শন করেছিল। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

২৮শে এপ্রিল ১৯৬৭ ॥ শুক্রবার

"আমার কাছে কোনো কয়েদির দেখা করা বা কথা বলা নিষেধ। তবুও সিপাহী জমাদারদের বলে এরা ফাঁকে ফাঁকে পালাইয়া আসে। কত দরদ ভরা এদের মন। কেন যে এরা আমাকে ভালোবাসে আজও বুঝতে পারলাম না।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২৩২-২৩৩)

প্রতিবেশীর প্রতি সহমর্মিতা

প্রতিবেশীর দায়িত্ব-কর্তব্যের প্রতি বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তাদের যথাযথ অধিকার আদায়ে তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এমনকি কারাগারে থাকাবস্থায়ও প্রতিবেশীদের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল প্রশংসাযোগ্য। এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

২৯শে এপ্রিল ১৯৬৭ ॥ শনিবার

"১২টার সময় দেখি রেণু কয়েক সের চাউল, কিছু ডাউল, তেল, ঘি, তরকারি, চা, চিনি, লবণ, পিঁয়াজ ও মরিচ ইত্যাদি পাঠাইয়াছে। আশ্চর্য হয়ে গেলাম। ডিভিশন 'ক' কয়েদিরা বাড়ি থেকে এসব আনতে পারে ডিআইজি প্রিজনের অনুমতি নিয়ে। অনুমতি নিয়েই পাঠাইয়াছে দেখলাম। ভালই হয়েছে। কিছুদিন ধরে পুরানা বিশ সেলে যে কয়েকজন ছাত্র বন্দি আছে তারা খিচুড়ি খেতে চায়। ...

আজ সুযোগ হয়ে গেল। মালপত্র পাওয়া গেল। বিকালে তাদের বললাম, যাহা হউক তোমাদের ভাবির দৌলতে খিচুড়ি মঞ্জুর করা গেল। আগামীকাল খিচুড়ি হবে।

যথারীতি রবিবার সকাল থেকে খিচুড়ি পাকের জোগাড়ে আত্মনিয়োগ করা হলো। রেণু কিছু ডিমও পাঠাইয়াছে। কয়েকদিন না খেয়ে কয়েকটা ছোট ছোট মুরগির বাচ্চাও জোগাড় করা হয়েছে। আমি তো জেলখানার বাবুর্চি, আন্দাজ করে বললাম কি করে পাকাতে হবে এবং আমার কয়েদি বাবুর্চিকে দেখাইয়া দিলাম।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২৩৪-২৩৫)

আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয় বন্ধুর জন্য দোয়া

বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন প্রকৃত ধার্মিক। এজন্য তিনি সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে দোয়া করতেন। শুধু তাই নয়, অন্যান্য মুসলিম ভাইয়ের জন্যও তিনি দোয়া করতে কোনোরূপ কার্পণ্য করতেন না। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

২৮শে মে-৩১শে মে ১৯৬৭

"আজ কাগজ দেখে ভীষণ আঘাত পেলাম। খবরটা পেয়ে আমার কথা বলাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভাবতেও কষ্ট হয় বন্ধু সহকর্মী ডা. গোলাম মওলা ইহজগৎ ছেড়ে চলে গিয়াছেন। ... দেশ একজন নিঃস্বার্থ নেতাকে হারাল। আর আমি হারালাম আমার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্মীকে। কিছুই করতে পারব না শুধু খোদাকে ডাকা ছাড়া। বন্দি জীবনে এই সমস্ত খবর খুব কষ্ট দেয়। ডা. মওলার চেহারা বার বার ভেসে উঠছিল আমার চোখের সামনে। আমাদের সকলকেই তোমার পথের সাথী একদিন হতে হবে মওলা। দুই দিন আগে আর পরে। তোমার আত্মা শান্তি পাক এই দোয়াই খোদার দরবারে করি।" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২৪৮-২৪৯)

আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আকিদা

ঈমান-আকিদার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু ছিলেন একেবারে নির্ভেজাল। আল্লাহ্ তা'আলার অপার ক্ষমতার ব্যাপারেও তিনি গভীর বিশ্বাস রাখতেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হিসেবে সেনানিবাসের কঠিন-কঠোর প্রকোষ্ঠে আটক থাকাবস্থায়ও আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

> "আমি মোমিন সাহেবকে বললাম, মনে হয় কিছু একটা ষড়যন্ত্র আছে এর মধ্যে। হতে পারে এরা আমাকে এ জেল থেকে অন্য জেলে পাঠাবে। 'অন্য কিছু একটাও হতে পারে' কিছুদিন থেকে আমার কানে আসছিল আমাকে 'ষড়যন্ত্র' মামলায় জড়াইবার জন্য কোনো কোনো মহল থেকে চেষ্টা করা হতেছিল। ডিসেম্বর মাস থেকে অনেক সামরিক, সিএসপি ও সাধারণ নাগরিক গ্রেপ্তার হয়েছে দেশরক্ষা আইনে– রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা উপলক্ষে, সত্য মিথ্যা খোদাই জানে!" (*কারাগারের রোজনামচা*, পৃ. ২৫২)

উপসংহার

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন যেমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তেমনি তাঁর লিখিত 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থটিও পাঠক সমাজে বেশ সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। কেননা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত জীবনের 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থটি এমনই অসঙ্কোচ সত্যের এক অনন্য নিদর্শন, যা বাঙালি জাতির জন্য একটি অনিঃশেষ আলোকবর্তিকা স্বরূপ। এতে ধর্মীয় ও নৈতিকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়াদি এত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যে, যেকোনো পাঠক তা থেকে খুব সহজেই শিক্ষা লাভ করে নিজ জীবনে প্রয়োগ করে সফলতা লাভ করতে পারবেন। তাই বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধুর কারাগারের দিনলিপিমূলক গ্রন্থটি সর্বস্তরের পাঠকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। গ্রন্থটি পাঠে অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য বঙ্গবন্ধুর ত্যাগ-তিতিক্ষা, নীতি, আদর্শ সম্পর্কে ধারণা লাভ করত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন করে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠতে পারে। আর এভাবেই বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব বলে আমাদের বিশ্বাস।♦

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান : প্রফেসর ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫। ই-মেইল: mahbub.ru2011@gmail.com
মো. আশরাফুল ইসলাম : এম.ফিল গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫। ই-মেইল: ashrafulislam0609@gmail.com

দেশপ্রেমিক তিন বীর তুর্কি নারীর

বীরত্বগাঁথা

কাজী আখতার উদ্দিন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর অটোমান সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরে। কিছু অংশ বিদেশী শক্তির দখলে চলে যায় এবং কিছু অংশ আলাদা হয়। টার্কিশ ন্যাশনাল মুভমেন্ট একের পর এক সামরিক এবং জাতিগত নির্মুল অভিযান শুরু করে। সামরিক

অভিযানগুলো ছিল পশ্চিমে গ্রিস, পুবে আর্মেনিয়া, দক্ষিণে ফ্রান্স এবং কনস্টান্টিনোপলে (বর্তমান ইস্তানবুল) ব্রিটেন এবং ইতালির বিরুদ্ধে। এছাড়া বিভিন্ন শহরে রাজতন্ত্রের সমর্থক এবং বিচ্ছিন্নতাবাদিদের মধ্যেও লড়াই শুরু হল। এই অভিযানগুলোর ফলশ্রুতিতে তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের অভ্যুদয় হয়।

১৯ মে ১৯১৯ থেকে ২৪ জুলাই ১৯২৩ সাল পর্যন্ত চলা এই যুদ্ধের পর ৩ মার্চ ১৯২৪ সালে অটোমান সাম্রাজ্য আনুষ্ঠানিকভাবে অবলুপ্ত করে সর্বশেষ খলিফাকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। কামাল আতাতুর্কের সংস্কারকর্মের পর আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্ক রাষ্ট্র গঠিত হয়।

এই যুদ্ধে হাজার হাজার নারী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে এই তিন বীর তুর্কি নারীর দেশপ্রেমের কাহিনী এখানে তুলে ধরা হল।

তুরস্ক তার দেশমাতা নেনে হাতুনকে ভুলে নাই

নেনে হাতুন

বিদেশী হানাদারের কবল থেকে স্বদেশকে রক্ষা করার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে নেনে হাতুন প্রমাণ করেছেন যে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল তুর্কিই যোদ্ধা।

যোদ্ধা-মাতা নেনে হাতুন বলেছেন যে, 'একটি তুর্কি শিশু অনাথ হতে পারে, তবে কখনও একটি স্বদেশ/মাতৃভূমি ছাড়া নয়।' বিদেশী হানাদারদের বিরুদ্ধে তুরস্কের প্রতিরোধ যুদ্ধের শতবর্ষী প্রাচীন প্রতীক হচ্ছেন এই নেনে হাতুন।

নবজাত সন্তানকে পেছনে ফেলে রেখে এই বীর তুর্কি মা, নেনে হাতুন জন্মভূমির জন্য লড়াই করতে এগিয়ে যান। ইতিহাসে তাঁর মত খুব কম ব্যক্তিই আছেন, যিনি চূড়ান্ত মাত্রার দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগিয়ে মাতৃভূমিকে প্রথম স্থান দেওয়ার জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্মকে উজ্জীবিত করেছেন।

এরজুরুম থেকে ২৫ কিলোমিটার পুবে সেপেরলি গ্রামে ১৮৫৭ সালে নেনে হাতুনের জন্ম। ষোল বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়।

পূর্ব তুরস্কের যুদ্ধ যখন চরম আকার ধারণ করে, তখন তাঁর বয়স ২০ বছরও হয়নি। তারপরও অকুতোভয় এই তরুণী তুর্কি সেনাদের পাশাপাশি লড়াই করার জন্য তার ছেলে এবং নবজাত কন্যাসহ সবকিছু ফেলে রেখে যেতে মোটেও দ্বিধা করেননি।

স্বদেশকে পরিবারের আগে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি বললেন, 'আল্লাহ এই সন্তান আমাকে দিয়েছেন, তিনিই তার হেফাজত করবেন।'

১৯ শতকে রুশ আগ্রাসন বেড়ে যাওয়ার ফলে উত্তর তুরস্কের অটোমান রাজ্য এরজুরুমে প্রতিকুল পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। এই শহরটিই ছিল নেনে হাতুনের নিজ শহর বা জন্মভূমি।

১৮৭৭-১৮৭৮ সালে রুশ-তুর্কি যুদ্ধের সময় নেনে হাতুন অজেয় তুর্কি দেশপ্রেম এবং তুর্কি নারীদের আত্মত্যাগ ও ক্ষমতার একটি প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। রুশ-তুর্কি যুদ্ধের শুরুতে, এরজুরুমের আজিজিয়া দুর্গ পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে অংশগ্রহণের কারণে তিনি সবার কাছে সুপরিচিত হন।

এরজুরুমের আজিজিয়া রণাঙ্গন রুশ সেনার দখলে চলে যাওয়ার পর শহরটির অটোমান তুর্কি সেনানায়ক স্থানীয় জনগণের সহায়তা চান, কেননা এই লড়াইয়ে তার প্রায় সকল তুর্কি সৈন্য শহীদ হয়েছিল।

তার ডাকে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার তুর্কি বেসামরিক নাগরিক নিজ নিজ বাড়িতে যে যা অস্ত্র হাতে পেল– রাইফেল, মুগর, কুড়াল, ছুরি নিয়ে আজিজীয়া রণাঙ্গনের দিকে ছুটে চললো। তাদের লক্ষ্য ২০০০ রণঅভিজ্ঞ শত্রু সেনাকে বিতাড়িত করা।

ওরা ঠিকই শত্রুকে হটাতে পেরেছিল, তবে অধিকাংশ শহরবাসীই সেই যুদ্ধে হতাহত হয়েছিল। এদের মধ্যে নেনে হাতুনও ছিলেন, তবে গুরুতর আহত হওয়ার পরও তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায় নেনে হাতুন এরজুরুম শহরের পার্শ্ববর্তী আজিজিয়ায় বাস করতেন। কাছেই একটি শহর রক্ষা দুর্গ ছিল। ১৮৭৭ সালে ৭ নভেম্বর রাতে, নেনে হাতুনের ভাই হাসান গুরুতর আহত হয়ে মারা যান। ৯ নভেম্বর রুশ সেনা আজিজিয়া দুর্গটি দখল করে। পরদিন সকালে যখন খবর পাওয়া গেল যে,

রুশ সেনারা আজিজিয়া শহররক্ষা দুর্গটি দখল করেছে, তখন নেনে হাতুন তাঁর মৃত ভাইয়ের কপালে চুমু খেয়ে ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ নিলেন। তিন মাসের শিশু-কন্যা এবং বালকপুত্রকে ঘরে রেখে, মৃত ভাইয়ের রাইফেল এবং একটি ছোট কুড়াল হাতে নিয়ে তিনি আজিজিয়া দুর্গ পুনরুদ্ধারের যুদ্ধে যোগ দিলেন। এই প্রতিরোধ যুদ্ধটিতে তুর্কিবাহিনী মূলত অসামরিক তুর্কি জনগণের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল, যার মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন নারী এবং বয়স্ক পুরুষ। ওরা কুড়াল এবং কৃষিকাজের হাতিয়ার নিয়ে লড়াইয়ে যোগ দিয়েছিলেন।

রুশ বাহিনীর গোলার আঘাতে শত শত বেসামরিক লোক নিহত হল, তবে ওরা সংখ্যায় এত বিপুল ছিল যে, বাদবাকিরা সব বাধা ডিঙিয়ে লোহার ফটক ভেঙ্গে দুর্গে ঢুকে পড়লো। এরপর শুরু হল হাতাহাতি লড়াই। পরিণতিতে ২০০০ রুশ সেনা নিহত হল এবং অবশিষ্টরা পালিয়ে গেল। নেনে হাতুনকে পাওয়া গেল গুরুতর যখম নিয়ে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছেন। তবে তার রক্তাক্ত হাতে তখনও ছোট কুড়ালটি ধরে রেখেছেন। তাঁর বীরত্বের জন্য তিনি মহিমান্বিত হলেন এবং সাহসিকতার একটি দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ালেন!

বাকি জীবন নেনে হাতুন আজিজিয়ায় কাটান। যুদ্ধপরবর্তী দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যেও চরম দারিদ্র্য এবং দুর্গতি সহ্য করে চার ছেলে এবং দুই মেয়েকে মানুষ করেন। তাঁর প্রথম ছেলে নাজিম প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শহীদ হন। পরের বছর তাঁর স্বামী মারা যান এবং তাঁর ছেলে ইউসুফ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে গ্যালিপলির লড়াইয়ে শহীদ হন।

১৮৭৭-৭৮ রুশ-তুর্কি লড়াইয়ের সর্বশেষ জীবিত অংশগ্রহণকারী হিসেবে ১৯৫৪ সালে তাঁকে স্মরণ করা হয়। সেসময় তৃতীয় তুর্কি সেনাবাহিনীর জেনারেল বারানসেল তাঁর সাথে সাক্ষাত করলেন এবং এরপর থেকেই আমৃত্যু তিনি 'তৃতীয়

সেনাবাহিনীর মা' হিসেবে পরিচিত হন। ১৯৫৫ সালের মা দিবসে তাঁকে 'মায়েদের মা' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

১৯২৩ সালে আধুনিক তুরস্ক রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর নেনে হাতুনকে 'কার্কগজ' পদবী দেওয়া হয়। এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'চল্লিশ চোখ'।

৯৩ সালের যুদ্ধ নিয়ে গবেষণা করার সময় সাংবাদিক ইসমাঈল হাবিব সেভুক ১৯৩৭ সালে যখন তাঁর কাহিনীটি পত্রিকায় প্রকাশ করেন, তখনই নেনে হাতুন একজন জাতীয় বীরে পরিণত হন।

১৯৫২ সালে ন্যাটোর সর্বাধিনায়ক বা সুপ্রিম এলাইড কমান্ডার ছিলেন আমেরিকান জেনারেল ম্যাথুই রিজওয়ে। তিনি একটি সরকারি সফরে এরজুরুম আসেন এবং সেখানে তুর্কি রীতি অনুযায়ী নেনে হাতুনের হাতে চুমু খান।

তাঁর মর্যাদাবোধ এবং বীরত্বের কাহিনী সকল তুর্কিবাসীর মনে গভীরভাবে গেঁথে রয়েছে। তাঁর জীবন নিয়ে কয়েকটি বই রচনা করা হয়েছে এবং ১৯৭৩ সালে তাঁর জীবন কাহিনী নিয়ে *গাজি কাদিন* নামে একটি চলচ্চিত্রও নির্মাণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন এবং ২২ মে ১৯৫৫ আঙ্কারার নুমুন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৯৮ বছর।

তাঁকে তার জন্মভূমি এরজুরুমের আজিজীয়া রণাঙ্গনের শহিদদের কবরস্থানে সমাহিত করা হয়েছে। এই স্থানেই তিনি বীরত্বের সাথে অনেক বছর দেশের জন্য লড়াই করেছিলেন। প্রতি বছর হাজার হাজার তুর্কি নাগরিক এই যোদ্ধা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর সমাধিতে আসেন।

সূত্র: এম. তালাত উজুনিয়ালালি। এফসানে কাদিন-নেনে হাতুন (২০১৩) ওয়াক্কাস দোগানতেকিন

শহীদ শরিফা বেসি (মৃত্যু ডিসেম্বর ১৯২১)

জাতীয় সংগ্রামের একজন নারী মিলিশিয়া শরিফা বেসির জন্ম আনু. ১৯০০ সাল।

তুরস্কের জাতীয় সংগ্রামকালে বৃদ্ধ এবং নারীরা অবিরাম অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ বহনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সাগর পথে এগুলো ইনেবলু আনা হতো, তারপর কাস্টামনুর উপর দিয়ে আঙ্কারা নেওয়া হতো। ওদের এই অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলেই ফ্রন্ট লাইনের প্রত্যেক পুরুষ যোদ্ধা অস্ত্র হাতে শত্রুর মুখোমুখি হতে পেরেছিলেন। এই মানুষগুলোর মধ্যে একজন ছিলেন সিদিলারের শরিফা বেসি। ইনেবলু থেকে কাস্টামনু গোলাবারুদ বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় ইনি ঠাণ্ডায় জমে মৃত্যুবরণ করে একজন শহিদ হয়েছিলেন। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরের প্রচণ্ড শীতে একটি বলদটানা গাড়িতে করে গোলাবারুদ বহন করার সময় তিনি কাস্টামনু ব্যারাকের সামনে এসে পিঠে বাচ্চা নিয়ে ঠাণ্ডায় জমে মৃত্যুবরণ করেন।

গ্রামের মেয়ে শরিফা বেসি ষোলবছর বয়সে বিয়ে হয়। আর ২০ বছর বয়সে তিনি মারা যান। বিয়ের দুইমাস পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে তার স্বামী সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ছয় মাস পর তিনি স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পান। গ্রামের মুরব্বীরা বললেন, 'এত কম বয়সে তার একা থাকাটা ঠিক হবে না'। কাজেই তোপাল ইউসুফ নামে যুদ্ধফেরত এক ব্যক্তির সাথে তার আবার বিয়ে হয়।

তিন বছর পর শরিফা গেলিন ও তোপাল ইউসুফ একটি মেয়ে শিশুর জন্ম দেন। ওরা ছোট্ট মেয়েটির নাম দেন, 'এলিফ'। ছোট্ট এলিফ মায়ের বুকের দুধ খাওয়া শুরু করতেই শরিফা গেলিনের স্তনে দুধ বেড়ে গেল। প্লেগের কারণে তখন বহু শিশু মা হারিয়ে এতিম হয়েছিল। এই সুযোগে তার প্রতিবেশীরা, গ্রামের সমস্ত এতিম মাতৃহারা শিশুদের শরিফা গেলিনের কাছে নিয়ে এলেন আর তিনিও তাদের স্তন্য দান করলেন। কালক্রমে গ্রামের সকল এতিম শিশু দুধভাই/বোনে পরিণত হল এবং তিনিও সকল এতিম শিশুর দুধ মা হলেন।

ঘরের কাজ ছাড়াও শরিফা গেলিন বাইরের কাজও করতেন, যেমন একটি গাধার পিঠে বোঝাই করে পাহাড় থেকে লাকড়ি আনতেন। তাঁর স্বামী তোপাল ইউসুফ কেবল নামে মাত্র একজন স্বামী ছিলেন। যুদ্ধের সময় তার বাম পা কাটা পড়েছিল আর কাছেই একটি বোমা বিস্ফোরিত হওয়ায় তার এক চোখ অন্ধ হয়েছিল। শ্রবণ ক্ষমতাও দিন দিন কমে এসেছিল। এমন অবস্থায় তিনি কোন কাজ করতে পারতেন না। তাই শরিফা গেলিনই প্রতিদিন ঘর এবং বাইরের কাজ করতেন।

একদিন গ্রামের চৌকিদার চেঁচিয়ে ঘোষণা করলো: 'হে গ্রামবাসী! শুনুন! শুনুন! আমার কথা শুনুন! প্রত্যেক বাড়ি থেকে প্রতি শুক্রবার একটি গরুর গাড়ি ইনেবলু যাবে সেখান থেকে মালামাল বহন করার জন্য. . . '

সেদিন সন্ধ্যায় গ্রাম প্রধান গ্রামের সভায় ঘোষণা করলেন:

'আপনারা তো জানেন গ্রিক সৈন্যরা আনাতোলিয়া আক্রমণ করেছে। তাদের উপর সর্বশেষ একটি প্রতি আক্রমণ করার জন্য আঙ্কারার সদ্য প্রতিষ্ঠিত কাউন্সিল ও সরকার পুরো শীতকাল ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আশা করি এম. আকিফ আমার কথাগুলো শুনছেন। তিনি দুই মাস আগে আমাদের গ্রামে এসে মসজিদে ধর্মপোদেশ দিয়েছেন: 'এই জাতির অস্তিত্ব রক্ষা এবং বেঁচে থাকার অধিকার ব্যাপারে আপনার উপর যদি কোন দায়িত্ব বর্তায়, তাহলে তা পরিপূর্ণ করতে ইতস্তত করবেন না। যদি আমাদের কখনও প্রয়োজন হয় মাতৃভূমিকে আলিঙ্গন করার, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই মৃত্যুর বাহু জড়িয়ে ধরার জন্য তৈরি থাকতে হবে, যাতে আমরা বলতে পারি যে এই দেশ আমাদের।' আপনারা জেনেছেন নিশ্চয়ই আমাদের চারপাশের গ্রামের অধিবাসীরা সাগর পথে ইনেবলু বন্দরে আনা গোলাবারুদ বহন করার কাজ করছেন। এটাকে ইমেস (গ্রামের যৌথ কোন কাজ) বা সালমা (গ্রামের কোন কাজের জন্য কাউন্সিলের নির্দেশে প্রতিটি বাড়ি থেকে চাঁদা তোলা) বা আর যা ইচ্ছা বলতে পারেন, তবে এই মাল বহনের কাজটা অবশ্যই করতে হবে।'

গ্রাম প্রধান যে তালিকা তৈরি করেছিলেন তা পড়ে শুনিয়ে তার বক্তৃতা শেষ করলেন। সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো যেন জিজ্ঞেস করছে, 'কে কে নেই এই তালিকায়?' আটজন লোক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন না। তাদের বদলে নারী কিংবা তরুণরা যাবে। সেই সন্ধ্যায় গ্রাম চৌকিদার ঐ আটজনের প্রত্যেকের বাড়ি গিয়ে জানিয়ে আসলো, কখন এবং কীভাবে ওরা রওয়ানা দেবে। শরিফা গেলিন ছিলেন এদের একজন।

১৯২১ ডিসেম্বরে হঠাৎ বরফ পড়া শুরু হওয়ায় রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। গোলাবারুদগুলো ইতোমধ্যে বোঝাই করা হয়েছিল। মাল বোঝাই গরুরগাড়িগুলো একটার পর একটা রাস্তায় নামছিল। শরিফা গেলিন তার শিশুকন্যা আলিফকে সাথে নিলেন, কেননা তাকে দেখার মতো কেউ তখন গ্রামে ছিল না। তার গাড়িতে গোলাবারুদ বোঝাই করার পর তিনিও রাস্তা পাড়ি দিলেন। ইনেবলু থেকে বের হওয়ার ফটকে তিনি তার গরুর গাড়িটা থামালেন। বোমার শেলগুলোর মাঝে তার শিশু সন্তানের জন্য একটি জায়গা করলেন। এতক্ষণ মেয়েকে পিঠেই বহন করেছিলেন। তীব্র ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য তার গায়ে একমাত্র যে কম্বলটা ছিল, সেটা দিয়ে মেয়ে আর শেলগুলো ঢাকলেন, যাতে বরফ ওদের গায়ে না পড়ে। তারপর তিনি গরুর গাড়ির সামনে গিয়ে , 'বিসমিল্লাহ, বলে গাড়ি টানতে শুরু করলেন। এভাবে কিছুক্ষণ যাওয়ার পর গরুর গাড়িটা হঠাৎ থেমে পড়লো। শরিফা গেলিন বুকে কষ্ট বোধ করলেন; বলদটা চলছে না। শরিফা গেলিন বলদের গলায় বাঁধা রশিটা ধরে টানতে শুরু করলেন, তারপরও পশুটা নড়লো না। ঐ অলুক্ষুণে বলদটা একটু এগিয়েই আবার থেমে পড়লো। আধা ঘন্টা আগে যে বরফ পড়া শুরু হয়েছিল, তা এখন থেমেছে, তবে আবহাওয়া আরো ঠান্ডা হয়ে এল. . . . শরিফা গেলিন; 'আল্লাহর ওয়াস্তে কারা তসুন (বলদ) আমাকে নিরাশ কর না। আমার গাড়ি ভর্তি কামানের গোলা;

আমাকে এগুলো জলদি সীমান্তে পৌঁছাতে হবে। তোমাকে মিনতি করছি, দয়া কর চল. . . ।'

বলদটা সামনে আরেকটু এগোল, তারপর ঘাড় নিচু করে মাটিতে ঢলে পড়লো।

শরিফার মনে নেই কতবার সেই অলক্ষুণে ষাঁড়টা বিশ্রাম নিয়েছিল আর কতবার তিনি নিজেই গাড়িটা টেনে নিয়েছিলেন। তিনি বুঝতেও পারেননি কতখানি পথ পার হয়েছেন। তার খুব খিদে পেয়েছিল আর কোন কারণে খুব নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলেন। তখন তার শিশু কন্যা আলিফের কথা মনে পড়লো। স্বভাবতই শিশুটিরও হয়তো খিদে পেয়েছে। তিনি ভাবলেন, '*যদি একবার ছোট্ট আলিফকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারতাম।*' তবে আলিফও তখন ঘুমাচ্ছিল আর সে জেগে থাকলেও এই ঠাণ্ডায় তিনি তাকে বুকের দুধ খাওয়াতে পারবেন না। তিনি নিজেকে বলছিলেন, 'অন্তত আলিফ জেগে উঠার আগেই যদি কাস্টামনু পৌঁছাতে পারতাম।' ঠিক সেই মুহূর্তে শরিফা গেলিনও বুঝতে পারলেন যে, তিনি নিজেও শীতে জমে যাচ্ছেন। বরফের উপর ঢলে পড়ার পর কোনমতে নিজেকে সামলে গরুর গাড়িটায় উঠতে চেষ্টা করলেন। যতবারই চেষ্টা করলেন, ততবারই মাটিতে পড়ে গেলেন, কেননা হাত পা তখন প্রায় জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল। এদিকে ছোট্ট আলিফও প্রচণ্ডভাবে কাঁদতে শুরু করেছে, শরিফা গেলিন তখন হাতও নাড়াচাড়া করতে পারছেন না। তারপর একটা বন্ধনহীন কামানের মতো গরুর গাড়িটা শহরের বাইরেই কাস্টামনু ব্যারাকের কাছে পৌঁছে সেখানেই থেমে পড়লো!

তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকির স্মরণে সেডিলার শহরের মেয়র নগর ভবনের সামনে শরিফা বেসির সম্মানে ১৯৭৩ সালে একটি রিলিফ নির্মাণ করেন। আবার ১৯৯০ সালে শহরের রিপাবলিক স্কোয়ারে তানকেট অকটেম-এ একটি মনুমেন্ট নির্মাণ করেন, যাতে কামাল আতাতুর্ক, শরিফা বেসি এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কাস্টামনুর নারীদের প্রতিকৃতি তুলে ধরা হয়।

ইনেবলুর সৈকতের যেখান থেকে কাস্টামনু যাওয়ার রাস্তা শুরু হয়েছে, আজ সেখানে একটি পার্কে শরিফা বেসির মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই মনুমেন্টের উপর একটি ফলকে লেখা রয়েছে যে, শরিফা বেসির স্মরণে এই মনুমেন্ট ২০০১ সালের ৪ ডিসেম্বর স্থাপন করা হয়েছে। কাস্টামনুর সিডিলার জেলা এবং ইনেবলুতে শহিদ শরিফা বেসির নামে স্বাধীনতা যুদ্ধের এক বীর যোদ্ধার প্রতীক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

শরিফা বেসি হচ্ছেন তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে একজন বীর তুর্কি নারীর প্রতীক।

এছাড়া বহু প্রতিষ্ঠান তার নামে নামকরণ করা হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: শহিদ শরিফা বেসি প্রাইমারি স্কুল, শহিদ শরিফা বেসি শিক্ষক আবাস, কাস্টামনু শরিফা বেসি স্টেট হাসপাতাল, শরিফা বেসি হসপিটাল অব Obstetrics and Pediatrics এবং ইস্তানবুল শহিদ শরিফা বেসি হাই স্কুল।

২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি কাস্টামনুর ১২ জন নারী প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে ইনেবলু থেকে কাস্টামনু পর্যন্ত ১০৫ কিলোমিটার দূরত্ব তিনদিনে হেঁটে পার হয়েছেন। ৯১ বছর আগে শরিফা বেসি যে ভয়ঙ্কর পথ অতিক্রম করেছিলেন, তার স্মরণে ওরা এই পদযাত্রা করেন।

সূত্র: Şerife Bacı'nın Hikayesi" (in Turkish).

সার্জেন্ট হালিমা ক্যাভাস

হালিমা স্মরণে, যিনি তুরস্কের স্বাধীনতার জন্য পুরুষ সেজে লড়াই করেছিলেন।

১৯১৯ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত হাজার হাজার তুর্কি পুরুষ যখন দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছিলেন, তখন একজন নারী পুরুষের ছদ্মবেশে তাদের পাশাপাশি লড়াই করেছিলেন। একমুহূর্তের জন্যও তার পুরুষ সহযোদ্ধারা বুঝতে পারেনি যে, সার্জেন্ট হালিম ক্যাভাস একজন নারী, কেননা তিনি কেবল রণকুশলীই ছিলেন না– বরং ফ্রন্টলাইনে শত্রুর মোকাবেলা করেছেন, বিভিন্ন যুদ্ধ ইউনিটে অস্ত্র ও গোলাবারুদও সরবরাহ করেছেন।

তুর্কি সেনাবাহিনীতে যেহেতু পুরুষ যোদ্ধার প্রাধান্য ছিল, তাই তিনি নিজের হালিমা নামটি বদলে কেবল হালিম হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন এবং পুরুষ মিলিশিয়াদের সাথে মেশার জন্য প্রতিদিন সকালে মুখের লোম কামাতেন/শেভ করতেন।

তাঁর জন্ম ১৮৯৮ সালে তুরস্কের কাস্টামনু জেলার দুরুকে গ্রামে। হালিমার পরিবার চাননি যে, তিনি তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেন। তবে পরিবারের কথায় কান না দিয়ে পুরুষের ছদ্মবেশে তিনি তুর্কি বাহিনীতে যোগ দেন, যদিও সেনাবাহিনীতে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের লড়াই করার কোন বিধিনিষেধ ছিল না। যুদ্ধের সময় শত শত তুর্কি নারী দখলদার শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, সেক্ষেত্রে হালিমা কেন একজন পুরুষের ছদ্মবেশে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন, তার কারণ অনেক ঐতিহাসিক জানেন না।

হালিমা সেনাবাহিনীর লজিস্টিক ইউনিটে কাজ করতেন। কৃষ্ণ সাগরের ইনেবলু বন্দর এবং আঙ্কারার মাঝে যে তুর্কি সেনাদের মোতায়েন করা হয়েছিল, তারা যেন সময়মত ও যথাযথভাবে অস্ত্র এবং গোলাবারুদের সরবরাহ পায়, তা নিশ্চিত করার কাজে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। গরুর গাড়ি এবং মহিষের গাড়ি ব্যবহার করে তিনি হালকা এবং ভারী অস্ত্র বয়ে নিয়ে যেতেন।

হালিমার নিজ জেলা কাস্টামনুর সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক এর্দাল আসলান টিআরটি ওয়ার্ল্ডকে (TRT World.) জানান, 'সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে যে, তিনি প্রতিদিন তাঁর গালের অদৃশ্য দাড়ি কামাতেন, যা একজন নারীর জন্য অত্যন্ত কষ্টকর একটি কাজ ছিল।'

আসলান বলেন, এমনকি হালিমা যে একজন নারী, একথা প্রকাশিত হওয়ার পরও তিনি তুর্কি সেনাবাহিনীতে চাকুরি করার ব্যাপারে কোন ইতস্তত করেননি বা বিমুখ ছিলেন না। ১৯২৩ সালে তুরস্ক যখন একটি ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্রে পরিণত হল, তখন একটি আইন জারী করা হল, যাতে বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী এবং সেনাবাহিনীসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের সমঅধিকার ঘোষিত হয়।

আতাতুর্কের সাথে সাক্ষাত

স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে একবার হালিমার সাথে মোস্তফা কামাল পাশার দেখা হয়। তিনি তখন প্রতিরোধ যোদ্ধাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

আতাতুর্ক লক্ষ্য করলেন যে, তীব্র শীতেও হালিমা তার কোট পরেননি, বরং তিনি তার কোট খুলে বন্দুক আর গোলাবারুদের একটি পুটলি সেই কোট দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন বরফের কারণে যেন, এগুলো নষ্ট না হয়।

আতাতুর্ক তখন হালিমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তার গায়ে কোট নেই। তখন উত্তরে হালিমা বললেন: 'ঠাণ্ডায় আমার তেমন কিছু হবে না, তবে গোলাবারুদগুলো কোট দিয়ে ঢেকে রাখলে হাজার হাজার মানুষের জীবন বেঁচে যাবে।'

আতাতুর্ক তখন তাকে তার পরিচয়পত্র দেখাতে বললেন। আর তখনই তিনি বুঝলেন যে, হালিমা একজন নারী। তিনি তার ব্যক্তিগত তথ্যগুলো লিখে নিয়ে আঙ্কারায় ফিরে গেলেন।

লড়াই চলাকালে একই সময়ে তিনি জনসাধারণের অনুমোদন লাভ করলেন। ৯ জুন ১৯২১ সালে জর্জিয় এভারফ নামে একটি গ্রিক ক্রুজার থেকে ইনেবলু বন্দরের উপর বোমাবর্ষণ করা হয় আর সেই আঘাতে হালিমার পা গুরুতর জখম হল। তিনি পঙ্গু হয়ে পড়েন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আর ফিরে যেতে পারেননি।

যুদ্ধশেষে হালিমাকে আঙ্কারায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে আতাতুর্ক এবং তাঁর স্ত্রী লতিফার সাথে তার সাক্ষাত হয়। যুদ্ধে তার কীর্তির আলোকে তাঁকে সার্জেন্ট পদে উন্নীত করা হয় এবং সেই সাথে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করে তাকে সম্মানিত করা হয়। অবশেষে তাকে বিশেষ অবসরভাতা দেওয়া হয়।

ঐতিহাসিক আসলানের মতে ইউনিফর্ম পরে তিনি সকল জাতীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন এবং কাস্টামনুর মা হিসেবে সবার কাছে পরিচিত হন, যা সমগ্র আনাতোলিয়ার সমতুল্য ছিল।

হালিমা সারাজীবন কুমারি ছিলেন এবং ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। জীবনের শেষ ৬ বছর তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। শেষ দিনটিতেও তিনি দাড়ি কামাতেন এবং পুরুষের মতো ছোট করে চুল ছাটতেন।

সাকারিয়া প্রদেশে দুটি স্কুল এবং কাস্টামনুতে বাকপ্রতিবন্ধিদের একটি প্রাইমারি স্কুল হালিমা ক্যাভাসের নামে নামকরণ করা হয়েছে।

তার স্মৃতি এখন সমগ্র তুরস্কে অনুরণিত হয়।♦

সূত্র: TRT World , Kastamonu governor's page

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা কলঙ্কিত ইতিহাস

শামস সাইদ

রক্তাক্ত, ভয়াল-বিভীষিকাময় ২১শে আগস্ট রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় দিন। মৃত্যু-ধ্বংস-রক্তস্রোতের নারকীয় গ্রেনেড হামলায় প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের সহধর্মিণী ও আওয়ামী লীগের মহিলাবিষয়ক সম্পাদক আইভি রহমানসহ ২৫ জন নেতাকর্মী নিহত হন। আহত হন প্রায় ৫০০ জন নেতাকর্মী। তাদের অনেকেই ফিরে পাননি স্বাভাবিক জীবন।

সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বোমা হামলা, গোপালগঞ্জে তুষার হত্যাকাণ্ড এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে নেতা-কর্মী হত্যা ও গ্রেপ্তার জোট সরকারের প্রতিহিংসার রাজনীতির প্রতিবাদে দলীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ ও গণমিছিল ডেকেছিল আওয়ামী লীগ। সভা শুরু হলো বেলা সাড়ে ৩ টায়। শেখ হাসিনা সভাস্থলে পৌঁছলেন বিকেল ৫ টায়। খোলা ট্রাকের অস্থায়ী মঞ্চে ওঠে বসলেন। এ সময় ট্রাকে তার সঙ্গে জিল্লুর রহমান, আমির হোসেন আমু, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, আবদুল জলিল, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, মতিয়া চৌধুরী. শেখ ফজলুল করিম সেলিম, কাজী জাফরউল্লাহ, মোহাম্মদ হানিফ ও মোফাজ্জল

হোসেন চৌধুরী মায়াসহ আরো কয়েকজন কেন্দ্রীয় ও মহানগর নেতা-নেত্রী ছিলেন। ট্রাকের পাশেই নিচে ছিলেন ওবায়দুল কাদের, সাবের হোসেন চৌধুরীসহ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় ও মহানগর নেতা-কর্মীরা।

শেখ হাসিনা বক্তব্য শুরু করেন ৫টা ২ মিনিটে। ৫টা ২২ মিনিটে বক্তব্য শেষ করে 'জয় বাংলা' 'জয় বঙ্গবন্ধু' বলে হাতে থাকা একটি কাগজ ভাঁজ করে ডায়াস থেকে সরে যাওয়ার মুহূর্তেই দক্ষিণ দিক থেকে তাকে লক্ষ্য করে একটি গ্রেনেড ছুড়ে মারে। গ্রেনেডটি ট্রাকের বাঁ পাশে পড়ে বিস্ফোরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেখ হাসিনা ট্রাকের ওপর বসে পড়েন। সঙ্গে থাকা অন্য নেতারা এ সময় মানববর্মের মতো চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলেন। প্রথম গ্রেনেড হামলার মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ট্রাক লক্ষ্য করে একই দিক থেকে পর পর আরো দুটি গ্রেনেড ছোড়া হয়। এ সময় শেখ হাসিনার সঙ্গে থাকা দেহরক্ষী পুলিশরা কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। এ অবস্থায় মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়াসহ দেহরক্ষীরা শেখ হাসিনাকে ধরে ট্রাক থেকে দ্রুত নামিয়ে তার মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়িতে তুলে দেন। স্টেডিয়ামের দিক হয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে তাকে সরিয়ে নেওয়া হয়। শেখ হাসিনা যখন ঘটনাস্থল ত্যাগ করছিলেন তখনো একই দিক থেকে কয়েক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে গ্রেনেড এসে ঘটনাস্থলে বিস্ফোরিত হতে থাকে। একই সঙ্গে ভেসে আসছিল গুলির শব্দ। এসব গুলি-গ্রেনেড ঠিক কোথা থেকে ছোড়া হচ্ছিল তা বোঝা না গেলেও বেশ পরিকল্পিতভাবে যে হামলা হয়েছে তা বোঝা যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিস্ফোরণের শব্দ, আহতদের চীৎকার, রক্তাক্ত নেতা-কর্মীদের ছোটাছুটিতে পুরো এলাকার চেহারা বদলে যায়। শেখ হাসিনাকে সরিয়ে নেওয়ার পর ট্রাক থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় নামতে থাকেন দলের কেন্দ্রীয় নেতারা। যারা অচেতন হয়ে পড়েছিলেন, তাদের ধরে নামানো হয়। কী ঘটছে কিছুই বুঝতে না পেরে অনেক নেতাকর্মী এ সময় ছুটে দলীয় কার্যালয়ের ভেতরে যান। আহতদের মধ্যেও অনেককে ধরে ভেতরে নেওয়া হয়। অনেককে দেখা যায় পথে রক্তাক্ত অবস্থায় দৌড়াতে। গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনায় এলাকায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। আহতদের হাসপাতালে পাঠাতে বিড়ম্বনায় পড়তে হয় দলীয় নেতাকর্মীদের। এ অবস্থায়ই রিকশা, অ্যাম্বুলেন্স, প্রাইভেট কার, বেবিট্যাক্সি, এমনকি রিকশাভ্যানে করেও আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। এ সময় অনেকে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থেকে সাহায্যের জন্য আকুতি জানান।

ঘটনার পর উদ্ধার আর বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছিল একই সঙ্গে। কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময়ও 'জয় বাংলা' 'জয় বঙ্গবন্ধু' বলে স্লোগান দিতে থাকেন। রাস্তায় গ্রেনেড পড়ে থাকায় বা পাল্টা আক্রমণের ভয়ে পুলিশ সরাসরি দলীয় কার্যালয়ের সামনে না গিয়ে দূর থেকেই বিক্ষুব্ধ কর্মীদের লক্ষ্য করে ঘন ঘন টিয়ার গ্যাস ছুড়তে থাকে। এ সময় জনগণ ছোটাছুটি শুরু করলে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। এ সময় একজন উপ-পুলিশ কমিশনার রায়ট-কার নিয়ে টহল দেন। যেসব গাড়িতে আগুন জ্বলছিল, সন্ধ্যার দিকে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা এসে আগুন নেভান।

পুলিশের ভাষ্য: হামলাকারী যারাই হোক না কেন, তাদের টার্গেট ছিলেন শেখ হাসিনা, এটি নিশ্চিত। এ ছাড়া হামলা করা হয় দক্ষিণের সিটি ভবন অথবা পাশের পেট্রলপাম্পের গলি থেকে। গ্রেনেড হামলা থেকে কোনোভাবে বেঁচে গেলেও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা যেন প্রাণ নিয়ে ফিরতে না পারেন তার সব চেষ্টায়ই করেছিল হামলাকারীরা। তার গাড়ির কাচে কমপক্ষে সাতটি বুলেটের আঘাতের দাগ, গ্রেনেড ছুড়ে মারা চিহ্ন এবং বুলেটের আঘাতে পাংচার হয়ে যাওয়া গাড়ির দুটি চাকা সে কথাই প্রমাণ করে। নেত্রীর গাড়িতে হামলার ধরন দেখেই বোঝা যায় যে, এটি ঠান্ডা মাথায় হত্যার পরিকল্পনা। গ্রেনেড আক্রমণ ব্যর্থ হলে নেত্রীকে হত্যার বিকল্প পন্থা হিসেবে বন্দুকধারীদের তৈরি রাখা হয়। বন্দুকধারীরাই খুব হিসাব কষে নেত্রীর গাড়ির কাচে গুলি চালায়। এই গুলি বুলেটপ্রুফ কাচ ভেদ করতে ব্যর্থ হলে তারা গাড়ি লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছুড়ে মারে। কিন্তু এই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। সব শেষে গাড়ির চাকা লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে থামানোর চেষ্টা করে। এ অবস্থায় গুলির আঘাতে গাড়ির বাঁ পাশের সামনের ও পেছনের দুটি চাকা পুরোপুরিভাবে পাংচার হয়ে গেলেও চালক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে গাড়িটি বঙ্গবন্ধু এভিনিউর দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে ধানমন্ডির সুধা সদনে নিয়ে যায়।

বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলার পর পরই ধানমন্ডির ৫ নম্বর সড়কে শেখ হাসিনার বাসভবন সুধা সদনে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ধীরে ধীরে সেখানে জড়ো হতে থাকেন বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীরা। ৬টার দিকে শেখ হাসিনা সুধা সদনে এসে পৌঁছান। এর পরপরই সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে আসেন যথাক্রমে সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল, আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ, মতিয়া চৌধুরীসহ আওয়ামী লীগের অন্য নেতৃবৃন্দ। এই সময় বিবিসিকে টেলিফোনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। 'আমার কর্মীরা জীবন দিয়ে আমাকে বাঁচিয়েছে। গ্রেনেড যখন বিস্ফোরিত হচ্ছিল, তখন নেতা-কর্মীরা আমাকে ঘিরে রেখেছিল। তাদের অনেকেই আহত হয়েছেন।

এখনো আমার কাপড়ে তাদের রক্ত লেগে আছে।' এ কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও তৎকালীন সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা।

শেখ হাসিনা বলেন, 'সরকারের মদদে সারা দেশেই তো বোমা হামলার ঘটনা ঘটছে। আমাদের এ মিছিলটাই ছিল বোমা হামলা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। এ জন্যই তারা জবাব দিল গ্রেনেড মেরে। আমার বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে মুহূর্তে আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাড়িতে উঠব ঠিক তখনই ওই জায়গাটাই হামলাকারীরা টার্গেট করেছিল। পরপর ৮-১০টা গ্রেনেড ফাটে। দু-তিনটা অবিস্ফোরিত গ্রেনেড পড়ে আছে। আমাদের মহিলাকর্মীসহ অনেকে নিহত হয়েছেন। প্রেসিডিয়ামের প্রায় সব সদস্য আহত হয়েছেন। আইভি রহমানের অবস্থা খুবই খারাপ।'

শেখ হাসিনা সেদিন অভিযোগ করেন, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী যখন হতাহতদের উদ্ধার করছিল ঠিক সে সময় পুলিশ উল্টো লাঠিচার্জ করে ও কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। সরকারের মদদে এ গ্রেনেড হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে শেখ হাসিনা দাবি করেন। তিনি বলেন, পুলিশ আহতদের সাহায্য করতে এগিয়ে না এসে যেভাবে আমাদের নেতাকর্মীদের ওপর লাঠিচার্জ করল ও কাঁদানে গ্যাস ছুড়ল তাতে তো বোঝা যায়, এটা সম্পূর্ণ সরকারের মদদে করা হয়েছে। তারা একটার পর একটা এভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করবে এটা কখনো সহ্য করা যায় না।

হাসপাতালের চিত্র

ঘটনার পর থেকে কমবেশি আহত সবাইকে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। একদিকে আহত, অন্যদিকে দলীয় নেতা-কর্মী ও স্বজনদের ভিড়ে পুরো হাসপাতাল এলাকা যেন হয়ে ওঠে হাহাকার ভূমি। তিন শর বেশি আহতকে নিয়ে আসা হয় অ্যাম্বুলেন্স, ট্যাক্সিক্যাব ও সিএনজি বেবিট্যাক্সিযোগে। অনেকে হাসপাতালে ভর্তি হতে না পেরে চলে গেছেন রাজধানীর অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে। হামলার ঘটনার আধঘণ্টার মধ্যেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কমপক্ষে ৪০০ আহতকে আনা হয়। কিন্তু একই সঙ্গে এতজনকে চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় এবং চিকিৎসকের অভাবে অনেককেই মেঝেতে কাতরাতে ছিলেন। আত্মীয়স্বজনরা অনেককে শহরের অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে স্থানান্তর করেন।

এ হাসপাতালের করিডরে অবহেলায় পড়ে ছিলেন গুরুতর আহত সুফিয়া বেগম (৪৫)। বোমার স্পিলিন্টারের আঘাতে তার সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। রক্তাক্ত শরীরে তখনো জীবনের ক্ষীণ চিহ্ন ছিল। তার পাশে বসে বিলাপ

করছিলেন আয়শা মোকাররম। একজন চিকিৎসক, নিদেনপক্ষে একজন নার্সের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায় তিনি চীৎকার করছিলেন। কিন্তু এ যেন যুদ্ধাবস্থা। কারো সময় নেই কারো দিকে তাকিয়ে দেখার। আহত শত শত মানুষের অবস্থাও একই।

ষাটোর্ধ্ব এক বৃদ্ধ শুয়ে ছিলেন একটি ওয়ার্ডের মেঝেতে। পরনের প্যান্ট হাঁটু পর্যন্ত খোলা। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা এ বৃদ্ধের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। বোমার আঘাতে তার পেছনের পুরোটাই ঝলসে গেছে বা উড়ে গেছে। একটু পর পরই গুঙিয়ে উঠছিলেন তিনি। নাম বা পরিচয় বলার মতো অবস্থাও তার নেই। তার পাশে নেই কোনো স্বজন।

আহতদের শরীর থেকে ক্রমাগত রক্ত ঝরছিল। এ জন্য প্রয়োজন হয় পর্যাপ্ত রক্তের। হাসপাতালের দোতলার ব্লাড ব্যাংকের সামনে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের লম্বা লাইন সৃষ্টি হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত সেখানে ২৪ ব্যাগ রক্ত গ্রহণ করা হয়। এরপরও অনেকেই তৈরি ছিলেন স্বেচ্ছায় রক্ত দিতে। কিন্তু রক্ত সংগ্রহের ব্যাগের স্বল্পতা ও মাত্র দুজন নার্সের তত্ত্বাবধানে রক্ত গ্রহণ চলছিল বলে দাতাদের কাছ থেকে ঠিকমতো রক্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছিল না। আর এ কারণে এক পর্যায়ে স্বেচ্ছায় রক্ত দিতে আসা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন।

আইভি রহমান তার দু পা হারান। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের পর তাকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে মধ্যরাতে তার পেট ও হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচার চলছিল। পরে সেখানে মারা যান তিনি। এ ছাড়া আমির হোসেন আমু, মোহাম্মদ নাসিম বাঁ পায়ে, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত মাথা ও পায়ে, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ দু'হাঁটুতে, শেখ সেলিম, আবদুর রাজ্জাক, মহীউদ্দীন খান আলমগীর, শেখ বজলুর রহমান, কাজী জাফরুল্লাহ, পংকজ দেবনাথসহ চার শতাধিক নেতা-কর্মী-সমর্থক কমবেশি আহত হন। রাজধানীর সরকারি-বেসরকারি প্রায় সব হাসপাতালই ছিল আহতদের ভিড়ে ঠাসা।

আতঙ্কের নগরী ঢাকা

সন্ধ্যা ৬টায় প্রেসক্লাবের সামনে থেকেই দেখা যায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউর ওপর ঝুলে থাকা কালো ধোঁয়ার আকাশ। অল্প কয়েকটি মিনিবাস দুদ্দাড় ছুটে পালাচ্ছে, রাস্তায় সাক্ষী থাকছে কাচের গুড়ো। দু পাশের রাস্তায় হাজার খানেক নারী-পুরুষ-বৃদ্ধ-শিশু দাঁড়িয়ে আছে বিহ্বল হয়ে। আওয়ামী লীগের জনসভায় বোমা বিস্ফোরণের পর থেকেই পুরো ঢাকা আতঙ্কের নগরী। সচিবালয়ের দুই দরজায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন সারা দিনের ক্লান্ত কর্মচারী-কর্মকর্তারা। এ সময়েই আরো তিনটি চাপা বিস্ফোরণের শব্দ। অসহায় মানুষ রাস্তার দু পাশে জায়গা দখল করে। সচিবালয়ের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

আওয়ামী লীগ দলীয় সাংসদ অ্যাডভোকেট রহমত আলী সচিবালয়ের সামনে রক্তমাখা পাঞ্জাবি গায়ে দাঁড়িয়ে আছেন দলীয় এক সমর্থকের কাঁধে মাথা রেখে। আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে তখন জ্বলছে মোটরগাড়ি আর বাস। আহত সাংসদের দিকে মনোযোগ দেওয়ার মতো অবস্থা নেই কারো। বঙ্গবন্ধু এভিনিউ থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স-অ্যানেক্স ভবনের সামনে প্রাণচঞ্চল শিক্ষার্থীরা যেন পাথরের মূর্তি। হাসপাতালের সামনে নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গা নেই। কতজন হতাহত? বলা অসম্ভব। শুধু জানা যাচ্ছে, ওয়ার্ডের সামনের করিডরেও মারাত্মক আহত রোগীদের শুইয়ে দেওয়ার জায়গা নেই। ঢাকা মেডিকেল থেকে পিজি হাসপাতাল হয়ে শমরিতা, বাংলাদেশ মেডিকেল, হলিফ্যামিলি, সাউথ এশিয়া-আহতদের জন্য যথেষ্ট নয় এতগুলো হাসপাতাল। রক্তে মাখামাখি আহতদের অধিকাংশই চিকিৎসার আশা বৃথা বুঝতে পেরে একটু উপশমের আশায় বসে পড়েছেন রাস্তায়। মৃত্যুর এক মুহূর্ত দূরে থাকা এসব নারী-পুরুষকে ঘিরে ঢাকার বিভিন্ন রাস্তায় তৈরি হয় ছোট-বড় জটলা।

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় শহীদ হয়েছিলেন যারা

১. শেখ হাসিনার দেহরক্ষী ল্যান্স করপোরাল (অব) মাহবুব ২. রফিকুল ইসলাম ওরফে আদা চাচা ৩. মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ হানিফ ৪. রতন শিকদার ৫. হাসিনা মমতাজ রিনা ৬. রিজিয়া বেগম ৭. সুফিয়া বেগম ৮. লিটন মুনশি ৯. আবদুল কুদ্দুস পাটোয়ারী ১০. আবুল কালাম আজাদ ১১. আব্বাস উদ্দিন শিকদার ১২. আতিক সরকার ১৩. মামুন মৃধা ১৪. নাসির উদ্দিন সরদার ১৫. আবুল কাশেম ১৬. বেলাল হোসেন ১৭. আবদুর রহিম ১৮. আমিনুল ইসলাম মোয়াজ্জেম ১৯. জাহেদ আলী ২০. মোতালেব হোসেন ২১. মোশতাক আহমেদ সেন্টু ২২. মোমেন আলী ২৩. এম শামসুদ্দিন ২৪. ইসহাক মিয়া ২৫. আইভি রহমান।

১৫ ও ২১ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের লক্ষ্য অভিন্ন ও সুনির্দিষ্ট। ১৫ আগস্টের কুশীলবেরা কেবল বঙ্গবন্ধুকে নয়, তাঁর রাজনৈতিক আদর্শও হত্যা করতে চেয়েছিল। কারণ তারা জানত, বঙ্গবন্ধু এক অদম্য ও অপ্রতিরোধ্য সর্বজনীন চেতনার শারীরিক প্রতিমূর্তি হিসেবে নিজেকে আসীন করেছিলেন। তাঁকে না সরালে পাকিস্তানি ভাবধারায় রাজনীতি বাংলাদেশে নির্মাণ অসম্ভব। ২১ আগস্টের হত্যাকাণ্ডেও ১৫ আগস্টের আদর্শিক কুশীলবরা জড়িত এ কথা বলা যায়। বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম কলঙ্কিত দিন ২১ আগস্ট। ২১ আগস্টের বিচার সম্পন্নের মধ্য দিয়ে শহীদ ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গ এ বেধনাবিধূর অধ্যায়ের কিঞ্চিৎ হলেও উপশম পেতে পারে।♦

ক | বি | তা |

উন্নয়নের অপরূপ দিশারী

শামসুল ফয়েজ

অশ্রু ও রক্তের আকূল পাথার সাঁতরে
বাংলাদেশকে তুমি আনলে সমৃদ্ধির স্বর্ণ উপকূলে
তুমি লড়াই করেছো অনবরত বৈরীতার
শত-সহস্র নৃশংস শত্রুদের সাথে,
তবুও দেশকে-মানুষকে বিশ্ব সভ্যতার
প্রথম সারিতে বসাতে স্বপ্নের সারথি হয়ে
নিশিদিন মেতে রয়েছো অক্লান্ত-অবিরাম
বহুমাত্রিক বর্ণাঢ্য পরিকল্পনায়।
পৃথিবীর সোনালী দিগন্তে
তুমি উড়িয়েছো লাল-সবুজ পতাকা
সব ষড়যন্ত্রের বূহ্যভেদ করেছো দারুন
অর্জুনের মতো নিভুল-নিপুণ লক্ষ্যভেদে।
পিতা-মাতা-ভাই হারানোর হিমালয় সম
বেদনার পর্বত বুকের উপর ধারণ করে
তুমি দৃঢ় চিত্তে ধরে আছ
ময়ূরপঙ্খী নাওয়ের হাল
নিপীড়িত মানুষের মুখ
সুখের হাসিতে রাঙ্গাতে-সাজাতে।
বাংলার বুকে হীরক খচিত বর্ণে ও অক্ষরে
লেখা থাকবে তোমার সুন্দর নাম চিরকাল।

রক্ত নয়, বিপথগামিতা নয়

হাসান হাফিজ

দেখা যাচ্ছে বর্তমানও সর্বংসহা, পোড়খাওয়া মৃত্তিকাসমান
উপেক্ষা তাচ্ছিল্য ঘৃণা নিন্দা শ্লেষ শীতল ভ্রূকুটি শাপ
মনস্তাপ যা যা আছে–সবই ওর প্রাপ্য বা নিয়তি
মুখ বুজে সহ্য করছে, প্রতিবাদ হয়তো ওর অভ্যন্তরে
নিভৃতে ধ্বনিত হয়, দানা বেঁধে উচ্চকিত প্রকাশের
কোনোরূপ ঘটা কিংবা আয়োজন চোখে পড়ছে না,
চরাচরে চলেছে নৃশংস ধুম রক্তারক্তি নির্বিচার হত্যালীলা গুম
মানুষই স্বজাতি-রক্তে রাঙিয়ে তুলছে হাত, কিন্তু কোনো
কার্যকর প্রতিরোধ দৃশ্যমান হবে কিনা কারো জানা নাই,
বিপথগামিতা তীব্র, তারুণ্যের ধারা বইছে মর্মান্তিক ভুল পথে,
কোনো শঙ্কা অনুতাপ জাগছে না খুনিদের পাথর হৃদয়ে
আত্মঘাত কখনোই সঙ্কটের সমাধান ছিল না হবেও না
মনুষ্যত্ব কী আশ্চর্য কোন্ মন্ত্রে ষড়যন্ত্রে লুপ্ত রাতারাতি
মাটিও কী হারিয়ে ফেলেছে তার স্বাভাবিক সৃজনক্ষমতা?
নাহলে এমন তিক্ত বিষবৃক্ষ জন্ম নিচ্ছে কোন্ তরিকায়?
বন্ধ্যত্বে শত্রুরা খুশি, মানুষই তো ওরকম শত্রুতার চাষি।
ফাঁদ পেতে করে যাচ্ছে তারুণ্য শিকার, চলছে এই অবলীলাক্রম,
এমন ত্রিশঙ্কুদশা থেকে চাই মুক্তি পরিত্রাণ, সময় করে তা দাবি
রক্ত ও আঁধার কিন্তু কখনোই আরাধ্য বাঞ্ছিত নয়, হতেও পারে না।

হৈমন্তিকার মৃত্যুঞ্জয়

আ ফ ম ইয়াহিয়া চৌধুরী

ঢেউ খেলা ফসলের সোনালী শীষ
আদিগন্তে; শিশির স্নিগ্ধ দূর্বাঘাস,
চারিদিক ফুলেল; বেগুনে রঙ্গা জীহরুল,
দূরে- ঐ দূরে পলাশ শিমুল।

শুভ্র অভ্রে শরদিন্দু জ্যোৎস্না
শারদরাতে; নবপ্রভাতে সুগন্ধা হাসনাহেনা,
মধু আহরণে ভ্রমর ক্ষণে ক্ষণে
হৈমন্তিকায় নৃত্যরত- হৃদয়স্পন্দনে।

নিরন্ন, নিবস্ত্র, নিগৃহ প্রাবল্যে অশনি
মঙ্গার শোকোচ্ছ্বাস, দুর্ভিক্ষের অক্টোপাস।
মাভৈঃ কর্মীর হাতিয়ারে সৌর্যরা সংহারে
উত্তরাঞ্চলের মঙ্গার অনাহার।
শূন্যরে পূর্ণ করে; অন্ন দেয় নিরন্নরে,
দ্বীপ জ্বেলে যায় বঞ্চিত জনের পর্ণ কুঠিরে।
অনির্বাণ শিখায় লেলিহান অন্ন অধিকার।

কালের যাত্রার দ্রুতরথে, শরৎ হেমন্ত
অন্তে সমাগত- ঋতুহৃদ শীত ও বসন্ত;
নবান্নের অগ্রহায়ণ, পৌষের পার্বন;
আনন্দ আলোক ভরা প্রাণ।

মালঞ্চে মাধবীমঞ্জুরী, নিকুঞ্জে কুন্দরাজি;
পুণ্যধরায় রাস পূর্ণিমায় পূর্ণেন্দু প্রভায়
মানব হৃদয় অনন্ত ঐশ্বর্যী; মন্বন্তরে
বসুন্ধরায় শুভ কর্মধারায় হৈমন্তিকার মৃত্যুঞ্জয়।

দিনলিপি ২০২০

মাহফুজ পারভেজ

সেমেটারিতে ফিউনারাল পার্লার ছুঁয়ে একটি একটি দিন যায়
কবরগাহের অন্তিম সারিতে

দিন যায়
বারান্দায় থমকে থাকে ঘড়ির স্পন্দন
স্বরচিত শূন্যতায় দোলে কুচকানো ক্যালেন্ডার।

দিন যায়
মুখোশ ও হাত-মোজায় অবিশ্বাস্য মানুষদের
আইসিইউ, ভেন্টিলেটারের মহার্ঘ্য অপেক্ষায়।

দিন যায়
মধ্যাহ্নের ঝকঝকে আলোর স্মৃতিগর্ভে
প্রলম্বিত অন্ধ-রাত্রির স্বপ্নহীনতায়।

দিন যায়
দর্শকহীন আত্মনাট্যের মুদ্রা ও ভঙ্গিতে
একাকী ঢেউয়ের মতো বালুকাবেলায়।

দিন যায় তাদের সাথে,
পাখিধরাদের ফাঁদের বিষাদে যারা
যাবার বহু আগে চলে গিয়েছিল গন্তব্যে–
দিন যায়, এমনই চলে যাওয়ায়:

আমাদের জীবনের মাঝখান দিয়ে অলক্ষ্যে-অগোচরে দিন যায়
ছায়াহীন, শব্দহীন, সংকেতহীন বিবরের প্রচ্ছায়ায়।

শেখ হাসিনার জন্মদিন

খান-চমন-ই-এলাহি

তোমার স্বদেশপ্রেমের ভাষায় বিমুগ্ধ জনমন
শিল্পীর ক্যানভাসে আঁকে মুজিবের বাংলাদেশ।

তুমি চিরন্তন সাহসের নাম
তোমার কীর্তিগাঁথা দেশকালের সীমানা ছেড়ে
দূর বহুদুর, দিগ্বিদিক, দেশ-দেশান্তরে
কখন পৌঁছে গেছে কেউ জানেনা, যদি জানতো
বাতাস বলে দিতো
ঢেউ বলে দিতো
জোছনা বলে দিতো
বলে দিত আগুন, দিনের সূর্য, ফুলের সুবাস;
কেউ বলেনি কখন কীভাবে পৌঁছলে তুমি
মুজিব ভক্তের অন্তরে অন্তরে
তাহলে তুমি সেই সত্য-যার অপেক্ষায়
বেগম মুজিবের অভূতপূর্ব প্রার্থনা
রাত্রির অন্ধকার শিকল ভেঙে দিনের জন্য জাগরণ
আহা, কী সুন্দর তোমার নাম-
হাসিনা! শেখ হাসিনা! মুজিবতনয়া!
তোমার জন্মদিন
শরতের উদার আকাশ হয়ে ফিরে আসে বার বার
বাংলা ও বাংলাদেশের স্বাধীন জমিন জুড়ে।

শরৎ পরী

মঈনুল হক চৌধুরী

সজল হাওয়ার দোল লেগেছে
কাশের বনে,
জলহারা মেঘ অমনি ভাসে
ক্ষণে ক্ষণে।

দোয়েল শ্যামা গান শুনিয়ে
যায় যে দূরে,
বাংলা মায়ের এ রূপ দেখে
মনটা উড়ে।

জাজিম ঘাসে প্রজাপতি
মেললো ডানা,
এ মন আমার নাচতে থাকে
ধিনতা নানা।

শঙ্খ-ধবল বকের সারি
উড়ছে নীলে,
পদ্ম-শালুক ফুটে আছে
বিলে-ঝিলে।

নীল-সাদা মেঘ যায় যে ভেসে
আকাশ খামে,
শরৎ পরী মেললো পাখা
আমার গ্রামে।

শরৎ ছাড়া এমন দৃশ্য

গোলাম নবী পান্না

হাওয়ার পরশ ঢেউ খেলে যায় কাশফুলেরই ক্ষেতে
চোখের পাতায় মেলে ধরে সাদা চাদর পেতে।

সেই চাদরে ঢেকে পড়ে সবুজ ক্ষেতের আল
ক্ষেতের পাশে নৌকা চলে ছোট্ট চিকন খাল।

নৌকা খালে যায় না দেখা ভাসে পালের রেখা
কাশের আড়াল বলেই এমন পাল হেঁটে যায় একা।

দেখতে হলে সেই সে ছবি আমার গাঁয়ের বাঁকে
ঠায় দাঁড়াতে পারবে না আর দেখবে তোমায় ডাকে।

চুপটি বসে থেকো না তাই রূপটি দেখি চলো
শরৎ ছাড়া এমন দৃশ্য কে দেবে আর বলো।

ঠিক মনে নেই

মিজানুর রহমান মিখুন

শেষ কবে শিশির ছুঁয়েছি ঠিক মনে নেই,
শেষ কবে খালি পায়ে হেঁটেছি
ঘাসের নরম বুকে- ঠিক মনে নেই।
শেষ কবে কচি পাতা ছিঁড়ে
উড়ায়েছি সুখে ঠিক মনে নেই,
ঠিক মনে ঠিক মনে নেই সে সব কথা।
আজ রমনায় এসে মনে পড়ে গেলো
সেই সব কথা,-
কী দুরন্ত মনে মাঠের কোণে,
কাটতো বিকেল,
আজ তা মনে করতে করতে
হারিয়ে যাই বিস্মৃতির অতল তলে।

অ | নু | বা | দ | গ | ল্প |

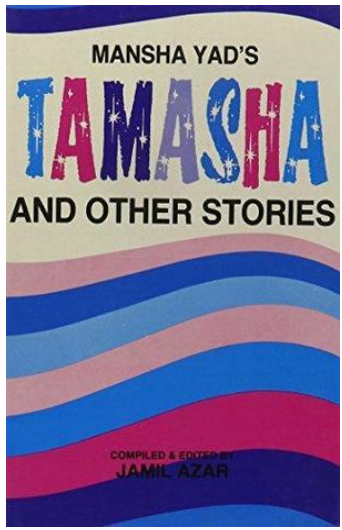

জেকবের চোখদুটো

মূল গল্প : মুহম্মদ মানশা ইয়াদ

ভাষান্তর : মিরন মহিউদ্দীন

তাঁর চুয়াত্তর বছর বয়সে মৃত্যু হয়েছে, মানশা ইয়াদের, যিনি উর্দু ছোটগল্পের জাদুগর ছিলেন। জন্ম ১৯৩৭ সালে পাকিস্তানের ফারুখাবাদে, মৃত্যু ১৫ অক্টোবর ২০১১। দশটি ছোটগল্পের সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে আজ পর্যন্ত। মুহম্মদ মানশা একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, সরকারের চাকরি করেছেন। মূলত নাট্যকার হলেও ছোটগল্পগুলোর জন্য তিনি প্রসিদ্ধ হয়ে থাকবেন। এই গল্পটি তাঁর বিখ্যাত গল্পগুলোর মধ্যে একটি।

তার পৌঁছনোর বিষয়গুলো সে বিশদে বলছিল, কিন্তু আমি তাতে মোটেই উৎসাহিত ছিলাম না। কোন ফ্লাইটে আসছে, কোন ক্লাসে আসছে, কিংবা কোন দিক থেকে আসছে সে। তৃষ্ণার্ত পৃথিবী জানতে চায় না মেঘটা পূর্বদিক না পশ্চিম দিক থেকে এল, সে কেবল বৃষ্টি চায়। আমার কাছে সেই এয়ারলাইনটাই সবচেয়ে ভালো যেটা এই ব্যস্ত সময়ে তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘরে পৌঁছে দেবে। যদিও সাত আট দিন অন্তর তার গলা আমরা শুনতে পাই কিন্তু আমরা তাকে সাতশ না আটশ' দিন দেখি নাই-আটশ' নিরানন্দ দিন এবং অগুন্তি রাত্রি, প্রতীক্ষার দুঃখের রাত্রিগুলো ও অসহ্য তৃষ্ণার রাত্রিগুলো। গলার স্বরের ছোঁয়া দেখা হওয়ার চেয়ে হয়ত ভালো বিকল্প, কিন্তু ভালোবাসা চায় শরীরের ছোঁয়া। মনে আছে প্রথম প্রথম যখন তার ফোন আসত তার মা কথা বলতে বলতে কাঁদতে শুরু করত। আমি বলতাম 'তোমার তো খুশি হওয়া উচিত', তিনি বলতেন 'আমি খালি ওর গলা শুনতে পাই, কিন্তু ওকে দেখতে পাই কি? সে কথা যখন আমি তাকে বললাম সে বলল 'সেটাও করা যেতে পারে ইন্টারনেট দিয়ে, কিন্তু তাতে কি মন ভরবে?

ও আসছে শুনে আমি খুশি হয়েছিলাম, কিন্তু ততটা খুশি নয় কারণ তার আসা মানে আর একটা বিচ্ছেদ, একবছর কিংবা দু-বছরের জন্যে বিচ্ছেদ। তাই আমি অপেক্ষা করতে চেয়েছি, কাকটাকে আমার বুকের দেয়ালে তার আসার সংবাদটা উচ্চারণ করতে সময় দিতে চেয়েছি। কিংবা সে আসুক আর এসে যেন আর না যায় তাই ভেবেছি। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো তাহলে বলব আমি তাকে কখনই এতদূরে যেতে দিতাম না। আমার বাবা চিরকালের জন্যে চলে যাবার পর হিসেব করে দেখলাম আমার জন্মের পর বাবা ঠিক পঞ্চাশ বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু লেখাপড়া আর চাকরির জন্যে আমাকে শহরে চলে আসতে হয়েছিল এবং আমার এই পঞ্চাশ বছর বা তেমনি সময়ের মধ্যে আব্বু খুব বেশি হলে পনেরটা বছর পেয়েছিল। এই হিসেবটা আমাকে বেশ কষ্ট দেয়। বাবা এই পৃথিবীতেই বেঁচে ছিলেন, কিন্তু আমি তাঁর থেকে দূরে পঁয়ত্রিশটা বছর কাটিয়েছি। তাঁর জীবদ্দশায় আমি কোনোদিন তাঁর অভাব বোধ করিনি। এখন যখন আমার নিজের ছেলে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, এখন বাবার মনের ব্যথা আর আবেগটা বুঝতে শুরু করেছি। যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন দু-তিনমাস অন্তর আমাদের কাছে আসতেন, এবং যে ক'টা দিন থাকতেন, চাইতেন আমি যেন অফিস থেকে ছুটি নিয়ে ঘরে থাকি যাতে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি। তবে আমি গ্রামে যেতাম দু-এক বছর অন্তর, আর সেখানে দুটো রাতের বেশি থাকতে পারতাম না। শহরের আকর্ষণ, উজ্জ্বল ঝাঁ চকচকে আকর্ষণ, আর আমার নিজস্ব স্বার্থ আমাকে টেনে নিত। কখনও কখনও সন্ধের সময় চলে এসেছি। বাবা বলত সন্ধেবেলা

লোকে ঘরে ফেরে, ঘর থেকে বাইরে যায় না। আমি ভান করতাম আমার খুব জরুরি কাজ পড়ে আছে। কী করে বলি আমার বাড়ি এখন অন্য জায়গায়।

আমার মনে আছে, একবার যখন সন্ধেবেলা চলে আসছি, বাবা কত দুঃখ পেয়েছিল। সবাই আমাকে আটকাচ্ছিল, বোঝাচ্ছিল সেটা কত খারাপ সময়, কিন্তু বাবা একটাও কথা বলছিল না আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না, বললেন, যদি মা বেঁচে থাকত তাহলে কি আমি অমন করে চলে আসতে পারতাম? তবু আমি নরম হলাম না, একটা অজুহাত দেখিয়ে চলে এলাম। সেই রাত্তিরটা এবং তারপরের এমন কত রাত্তির আব্বা নিশ্চয়ই যে যন্ত্রণায় কাটিয়েছেন সেটা আমি এখন আন্দাজ করতে পারি।

আমার মনে আছে, যখন আমি ছোট ছিলাম, আমার আব্বা জোসেফ আর তার প্রবঞ্চক ভাইদের গল্পটা বলতে ভালোবাসতেন, ভাইগুলো জোসেফকে মারবার জন্যে কুয়োর মধ্যে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। আমি শহরে চলে আসার পর আব্বা জোরে জোরে সেই গল্পটা রাতের বেলা পড়তেন। আম্মি আমাকে বলেছিল যে, আব্বু সেই অংশটা পড়তেন যেখানে জেকব তার ছেলের শোকে কেঁদে কেঁদে দুটো চোখ অন্ধ করে ফেলেছিল। কিংবা তিনি সেই অংশটা পড়তেন যেখানে জোসেফের দোকানদার, সংবাদবাহক বশির, জোসেফের জামা নিয়ে এসে শুভসংবাদটা দিল যে জোসেফ খালি বেঁচেই নেই, সে এখন মিশরের শাসনকর্তা। ঈশ্বরপ্রেরিত মানব জেকব যখন জামাটিকে চোখের কাছে নিয়ে এলেন, তখন চোখদুটি তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। মা আমাকে বলেছে ওই জায়গাটা পড়বার সময় তাঁর গলা কেঁপে যেত, এবং কিছু একটা অজুহাত দিয়ে পড়া বন্ধ করতেন। শেষের ক'টা বছর যখন তিনি আর পড়তে পারতেন না তখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি বিদায়ের সেই বয়েৎটি বারবার বলতেন।

পরের দিন আমির আবার ফোন করে বলল সে ওখানে সিট পাচ্ছে না, নিউইয়র্কে যাচ্ছে যদি কপালে থাকে পেয়ে যাবে, তারপর ফোন করে পৌঁছানোর খবর দেবে। আর যদি না পায় তাহলে ফিরে আসবে, করাচি কিংবা লাহোর পৌঁছে খবর দেবে। ও রাস্তা চেনে, নিজেই বাড়ি চলে আসতে পারবে।

দুতিন দিনের মধ্যেই সে আমাদের কাছে চলে আসবে, আমরা তাকে দেখতে পাব, ছুঁতে পারব, এই সুখের চিন্তাটা আমাকে একরকমের উত্তেজনা এনে দিল, আমার চোখদুটো বারবার তার মুখটা দেখতে লাগল।

ওর মা জোর করতে লাগল যেন সে ঈদের দু-একদিন আগেই এসে পড়ে। ও তো আগে থেকেই মা কে বলে রেখেছিল ঈদ শুরু করবে ওর জন্যে বিশেষ করে মায়ের রান্না করা সেমাইয়ের পায়েস দিয়ে। ফোনে কথা বলা হয়ে গেল, আমরা তার পরের জন্যে অপেক্ষা করছি, তখন কেউ ফোনটাকে ব্যবহার করলেই

ওর মা রাগে সিংহিনীর মত গর্জে উঠছিল। সারাটা দিন কেটে গেল, খারাপ ফোটকপি মেশিন থেকে বেরিয়ে আসা সাদা কাগজের মত কেটে গেল, তারপর শুরু হল রাতের লম্বা প্রহর। তার প্রোগ্রাম মত আজকে তার পৌঁছনোর কথা, কিন্তু এখনও পর্যন্ত যাত্রা শুরু করবার খবরটাই আসেনি। মাঝে মাঝে আমি ফোনটাকে তুলে দেখছি, সেটা খারাপ হয়ে যায়নি তো? এই সময়টার মধ্যে অনেকগুলো কল এল, কোনোওটাই কোনো কম্মের নয়। তাদের সঙ্গে আমরা খুব সংক্ষেপে কথা সেরে নিলাম। অধিকাংশই ছিল আমাদের আত্মীয়দের কাছ থেকে, ওর সম্বন্ধে জানতে চাইছিল আর কোনো খবর এল কীনা। তাতে আমরা আরও চিন্তিত হচ্ছিলাম, মুষড়ে পড়ছিলাম।

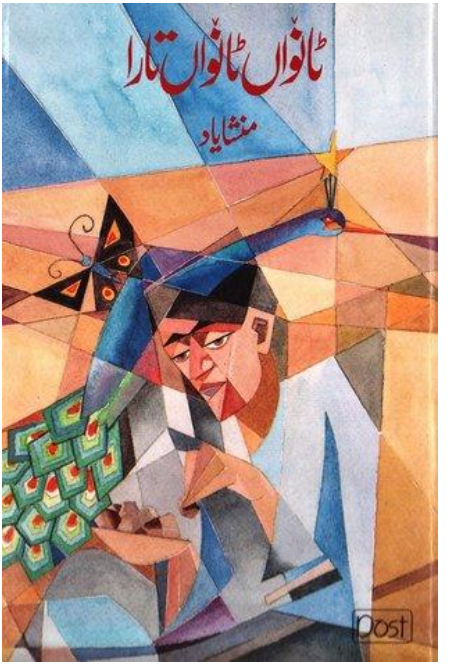

ওর মা ওর বিশেষ পছন্দের খাবার তৈরি করতে শুরু করল, তুলে রাখতে লাগল ফ্রিজের ভেতর। মায়েদের ভালোবাসা প্রকাশের এই একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের দিক। তাদের ব্যস্ত রাখতে এর তুলনা নেই, আর মমতা ভালোবাসা এতে ভালোই প্রকাশ হয়। মেয়েদের আর একটা সুবিধে হল, তারা সবক্ষেত্রে খানিকটা কেঁদে নিয়ে তাদের দুঃখ প্রকাশ করতে পারে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে কিছু পুরুষরাও আছে যাদের চোখের জল ফেলতে বিশেষ লজ্জাবোধ করে না, কিন্তু আমার মত সংস্কারহীন গেঁয়ো মানুষ মনে করে কাঁদলে তার পুরুষত্ব বিপদাপন্ন হবে। আমার মনে আছে যখন আমি প্রথমবার ঘর ছেড়ে

পড়তে যাচ্ছি শহরে, বিদায় দিতে বাড়ির সব মেয়েরাই চোখের জলে ভাসছিল। কিন্তু আব্বু কেবল আমার মাথায় হাত দিয়ে একটু একটু চাপড় মারার মধ্যেই নিজেকে সীমিত রেখেছিল। তার মানেই কী হল? আব্বু অনুযোগ করছিলেন তাঁর ঠান্ডা লেগেছে, এই বলে বারবার নাক মুছতে লেগেছিলেন।

কুকারের ঢাকনাটা খোলা আর বন্ধ করবার মাঝে কাঠের হাতা দিয়ে নেড়ে নিচ্ছিল ওর মা, মাংসটাকে শিল নোড়াতে ছেঁচে মিহি করে নিয়েছিল, আর তার ফাঁকে দু-এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে নিয়ে ধাতস্থ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার ভেতরকার প্রেসার কুকারটা অল্প আঁচে দম আটকে রেখেছিল, এত অল্প আঁচ যে ওজনটাকে ওঠাতে পারছিল না, সিটিটাও বাজাতে পারছিল না। কথা হল, আমিও ওর পছন্দের কথা মনে রেখেছি, ঈদের বাজার করবার সময় দু-একটা ভালো খাবার কেবল ওর জন্যেই এনেছি। কিন্তু যেন এটা কিছুই না, এই ভাবটাকে বজায় রাখতে কাউকেই কিছু বলিনি। আসলে খাদ্য এবং খাওয়া দাওয়ার ডিপার্টমেন্টটা মেয়েদের জন্যে সুরক্ষিত। আমি কী করেছি বলে দিলেও আসল কৃতিত্বটা মায়ের দিকে চলে যাবে। আমার মা হলেও একই রকম হত। আমার মা আমার পছন্দের খাবার তৈরি করতেন যেদিন আমি বাড়ি আসবার কথা। গ্রামের হালুইকরকে মিষ্টির বায়না দেয়া হতো, আর কোনো ফল বা ভালো খাবার ফেরিওলা আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে হাঁক পেড়ে কিছু বিক্রিবাটা না করেই চলে যাবে এমন সাধ্য ছিল না। আব্বা বলতেন, মা পাঁচদিন মৃত থাকতেন, কিন্তু শনিবারের দিন যেন মেশিন হয়ে যেতেন। সেদিন মা রান্না করতে করতে, কিংবা বিছানার চাদর বালিশের ওয়ার পাল্টাতে পাল্টাতে মৌলবী আবদুল সাত্তারের বয়েৎ গুনগুন করতেন।

তারপর এসব কাজ করবার পরেও যদি কিছু সময় পেতেন, তখন তাঁর রংচঙে চরকাটা দিয়ে ছাদে চলে যেতেন, যে রাস্তাটা শহরের দিক থেকে এসেছে সেদিকে তাকিয়ে তিনি আনন্দময় প্রহরার সুতো কাটতে লাগতেন। আমার সাইকেলের চাকার ঘূর্ণন আর মায়ের চরকার ঘূর্ণন একসঙ্গে চলত। ঘরে ফেরার রাস্তাটা সব সময়ে আনন্দময় হতো। বাতাসটা আমার উল্টোদিকে বইলেও মনে হতো একটা অদৃশ্য সুতো আমাকে টেনে নিচ্ছে। আব্বাও ভুলে যেতেন, ঘরের বাইরে কী সব কাজ পড়ে আছে। তিনি কোনো একটা অজুহাতে ঘরের ভেতরেই থাকতেন, কাঠগুলোকে টুকরো করতে বসতেন, ভাঙা চারপাইকে ঠিক করতে বসতেন, কিংবা সেগুলোর ঢিলে ফিতে টান টান করতে বসতেন। কিন্তু আব্বা কখনই প্রকাশ করতেন না যে এইসব কাজগুলো, যেগুলো সারা সপ্তাহের জন্যে নির্ধারিত ছিল, তাদেরকে কেন আজই শেষ করে ফেলতে হবে। আমার কিন্তু অনেক জিনিস ছিল নিজেকে ব্যস্ত রাখবার জন্যে। যদি বই পড়তে ভালো না

লাগত, তাহলে অডিও কিংবা ভিডিও ক্যাসেট ছিল, সিডি ছিল। তার সঙ্গে ডিস এন্টেনা আছে, কয়েকটা নব ঘুরিয়ে পৃথিবীর নানা জায়গার ভালভাল অনুষ্ঠান দেখতাম। কম্পিউটারে টাইপ করবার অভ্যাস করতাম, দাবা খেলতাম, কিংবা এনসাইক্লোপডিয়া খুলে ঘন্টার পর ঘন্টা ডুবে থাকতাম।

ওর মা রান্না নিয়ে ব্যস্ত রইল, আমি টিভি দেখলাম, গান শুনলাম, কিন্তু আমাদের মনে হল যেন আমরা রাতের সমুদ্র পেরিয়ে এলাম, আমাদের ক্লান্ত হাত-পা দিয়ে ঝাঁপাঝাঁপি করে সাঁতার কাটলাম, যেন একটা পা নেই। যদিও আমরা ভোরে উঠে সেহরি খেলাম, কিন্তু কেউই ভরপেট খেলাম না। একটাই প্রশ্ন ছিল সবার মনে কিন্তু কারও কাছে তার উত্তর ছিল না।

আমার মা প্রায়ই এমন এমন কথা বলতেন যার মানে বিদেশ জায়গাটা যে অশুভ তা সবাই জানে। আব্বা কিছুটা হলেও বাস্তববাদী, বলতেন পার্থিব উন্নতির একটা উপায় হল বাইরে যাওয়া। তিনি গল্প পড়তেন রাজপুত্র আর বণিকপুত্রদের, যারা নতুন নতুন অভিযান করতে দূরদেশে চলে যেত, ব্যবসা করতে যেত সুন্দর পর্বতময় পরীদের দেশে। তারা দৈত্যদের আর জিনদের সঙ্গে লড়াই করত,

তারপর একদিন উটের পিঠে সোনাদানা মণিমুক্তো ভর্তি করে বিজয়ীর বেশে ফিরে আসত, সঙ্গে আনত সুন্দরী কন্যা কিংবা আস্ত একটা পরী।

আমি ভাবতে শুরু করেছিলাম নতুন যুগে তার নিজের মত পর্বতমালা আছে। আল্লামা ইকবালের আশা 'পুজিবাদীরা দৌড়ে পালিয়েছে, শো হয়ে যাবার পর সার্কাসওলা চলে গেছে', সেকথা সত্যি প্রমাণিত হয়নি। বিজ্ঞান টেকনোলজি আর যন্ত্রশিল্পের উন্নতি বরঞ্চ পুঁজিবাদীদের হাত এতটাই শক্ত করেছে, এতটাই তাকে আকর্ষণীয় করেছে, যে অন্য সব দিকের চিন্তা ভাবনাকে তার সামনে আজ ভুল বলে মনে হচ্ছে। শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান মনগুলোর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পৃথিবীর অন্য জাগতিক ভাবনা চিন্তাকে দাবিয়ে দিয়েছে পুঁজিবাদ। উন্নতিশীল দেশগুলোর যুবকেরা, যারা স্বপ্ন দেখত এই সব জাদু শৈলের, এখন আকুল আকাঙ্ক্ষা করছে তাদের টোফেল, জিম্যাট আর ভিসা কাগজগুলো পাবার।

এখন আমরা অপেক্ষা করছি তার যাত্রা শুরু করবার খবরের জন্যে নয়, আমাদের দেশের কোনো শহরে, করাচি লাহোর বা ইসলামাবাদে তার পৌঁছনোর খবরের জন্যে। মোটরকারটাতে পেট্রোল ভরিয়ে ঝেড়ে মুছে তৈরি করে রাখা হয়েছে, যাতে এয়ারপোর্টে সেটা তক্ষুনি যেতে পারে। গাড়িটাকে আমরা খুব প্রয়োজন ছাড়া একদম ব্যবহার করিনি, সেটা এয়ারপোর্টে যাবার জন্যে রেডি হয়ে আছে, কিন্তু টেলিফোনটা চুপ করে আছে, সেই সঙ্গে উদ্বেগের ছায়া, মানসিক আশঙ্কা আর ভয় এগিয়ে আসছে। আমরা দুজনে আমাদের অভিনয়টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম, একে অপরকে দেখাচ্ছিলাম যেন একেবারে ঠিকঠাক আছি। তবে আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো আওয়াজ শুনবার জন্যে টানটান হয়ে ছিল। টিভির নাটকে টেলিফোন বাজলেও আমরা লাফিয়ে উঠে দৌড়চ্ছিলাম ওটার দিকে।

আশেপাশের বাড়ির লোকেরা ছাদে উঠে দেখতে শুরু করল সরু চাঁদটা উঠছে কীনা। যেখান দিয়ে আমাদের পবিত্র চাঁদটা উঠবে তারা সেইদিকটা দেখছিল। কিন্তু ফোনটা একেবারেই বাজল না, যদিও বা বাজল, সেই একঘেয়ে কথাবার্তা শুরু হল–

'কোনো খবর পেলে?'

'না'

'কেন?'

'জানি না তো'

'হয়তো একেবারে শেষে চান্স পেয়েছে, ফোন করবার সুযোগ পায়নি।'

'হতে পারে'

'রাস্তায় আছে হয়ত'

'আল্লা তাই করুন'

অনেকগুলো এয়ারলাইনের খবর নিয়ে এলাম, কিন্তু পি.আই.এ তার বেশকিছু ফ্লাইটকে ঘুরিয়ে দিয়েছে বেশি ভিড় হবার জন্যে, ফলে কোন জায়গায়, বা কখন সে পৌঁছবে বলা মুশকিল। ইফতারির সময় তাঁর গভীর অনুভব শোনা গেল,

'আল্লা আর যেন চাঁদ না দেখান।'

'আমাদের উপবাস আরও একদিন বেড়ে যাবে।'

'সেটা কোনো ব্যাপারই নয়, কাল সে পৌঁছে যাবে।'

'কিন্তু কাল পর্যন্ত যদি কোনো খবর না আসে?

'অমন কথা বোলো না, আমার ভয় করছে।'

চাঁদ দেখা দিল, অন্য সবাই ঈদ পালন করল। নুসরৎ ফতে আলী খান গান করছিলেন এত ভালো করে যে রক্তঝরা হৃদয় শান্ত হয়ে যাবে, গাইছিলেন 'আমার কাছে হাজার ঈদের চেয়েও ভালো, প্রিয় তোমার দেখা পাওয়া।'

ওর মা রান্নাঘরে বসেছিল, রান্না করছিল মিষ্টি সেমাই, আর চোখের জল ফেলছিল, তেতো জল। আমি বিশেষ কোনো কাজ করছিলাম না। টেলিফোনটা বাজল কিন্তু কানেকশনটা হল না, কথা বলা গেল না। কয়েকবারই এমন ছিল। আমরা আন্দাজ করলাম ছেলেটা বিদেশ থেকে চেষ্টা করছে কিন্তু ভিড়ের জন্যে পাচ্ছে না লাইন। আমরা আশ্বস্ত হলাম যে সে ঠিক আছে, কিন্তু আমরা আরও দুঃখিত হয়ে পড়লাম, ছেলেটা ঘর থেকে অনেক দূরে আছে, কিন্তু কোথায়? সেটা আমরা জানতে পারলাম না, কারণ এরপর ফোনটা চুপ করে রইল, সারা রাত চুপ করে রইল।

তারপর থেকে সেই একই, রান্নাঘরটা তার, আমার কাছে টিভির রিমোট কন্ট্রোল। আজ আমি বুকের ধ্বকধকানি নিয়ে শুনলাম বিবিসি আর সিএনএন এর হেডলাইন, প্রার্থনা করলাম যেন সব বাস ট্রেন প্লেন, সবার সফর যেন বিপদমুক্ত থাকে। তারওপর যদিও তার রান্না করবার উদ্যমটা অনেক মিইয়ে গেছে তবু রান্না ঘরে মেয়েদের অনেক কাজ থাকে, বিশেষ করে উৎসবের দিনগুলোতে। ভোর আড়াইটা তিনটের সময় ও ঘরে এল, একটু কাঁদল, শান্ত হল, ঘুমিয়ে পড়ল।

ঈদের সকাল। সারারাত না ঘুমিয়ে আমি যখন উঠলাম পুরো ঘরটাতে বিমর্ষতা ছড়িয়ে ছিল। আমার মনে আছে ঈদের সকালে সে সবার আগে প্রস্তুত হয়ে নিত মসজিদে যাবার জন্যে, আমাকে বারে বারে ডাকাডাকি করত। সে জানত আমি সবসময়েই দেরি করে ফেলব, এবারে শেষের সারিতে জায়গা পাব। আজ আমি খুব তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিয়েছি, কারণ প্রতিবার আমি বেশ ঘুমিয়ে ফেলে দেরি করে ফেলেছি।

মসজিদের রাস্তাতে এক ছোট দোকানদার তার টেপ রেকর্ডারটা খুব জোরে বাজাচ্ছিল। আবিদা পরভীন গান করছিলেন, 'হে দয়াল তুমি মায়েদের কাছে ছেলেকে এনে দাও'। আধুনিক যুগের পৃথিবীর দয়ালদের কথা আমি ভাবলাম, মনে মনে প্যারডি তৈরি হয়ে গেল 'হে শত্রু, তুমি মায়েদের কাছ থেকে ছেলেদের দূরে সরাও, বোনগুলোকে ভাইদের থেকে সরিয়ে দাও।'

ঈদের নামাজের সময় আমি কল্পনায় দেখলাম সে দাঁড়িয়ে আছে আমার পাশে তার ভায়েদের সঙ্গে। তখন আমি আমার ডানদিকের লোকেদের আশীর্বাদ দিলাম, আমার বামদিকের লোকেদের আশীর্বাদ দিলাম। আমার প্রার্থনা করতে অন্যদের থেকে বেশি সময় লাগল-ডান বাম ওপর নীচ, এবং যারা ভ্রমণ করছে তারা, এবং যারা ভ্রমণ করছে না তারাও, সবাইকে আশীর্বাদ জানালাম। আল্লাহর কাছে যেন বিপদে না পড়ে তাই চাইলাম।

বাড়ি ফিরে এলাম, আশা ছিল কিছু ভালো খবর এসেছে, কিন্তু তার মা গেটের কাছে ভিখারীর মত দাঁড়িয়ে, বললাম, 'আল্লাহ মাকে একটা ভালো খবর দাও'। সারা দিনটা সে অতিথিদের অভ্যর্থনা করল, কিন্তু ছেলের জন্যে বিশেষ উপাদেয় খাবার বাঁচিয়ে রাখল। এটা ওর প্রিয়, ওটা ওর ভাগের, এটা ও খেতে ভালোবাসে, আনন্দ করে খাবে। আমি বুঝতে পারছিলাম না আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি! আমার অস্তিত্ব রয়েছে না নেই? তারপর আবার এল সেই লম্বা রাতের চিরন্তন অপেক্ষা। আমি নিজের ঘরে গেলাম, যেন অসুস্থ এমন ভান করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম, গায়ে দিলাম সুন্দর সুন্দর সব স্মৃতির চাদর।

কয়েক বছর আগে আমার পাকস্থলিতে একটা জটিল অপারেশন হয়েছিল, ফলে আমাকে কয়েক সপ্তাহ হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। ও প্রতিদিন ফোন

করে ডাক্তার নার্সদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলত, জানতে চাইত আমি কেমন আছি। প্রত্যেকবার সে জোর করত আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে। আমার কাটা অংশটা কাঁচা, সেলাই করা, ব্যাণ্ডেজ করা, যন্ত্রণাদায়ক, সুতরাং আমি রিশেপসন পর্যন্ত গিয়ে টেলিফোন ধরতে পারতাম না। ফোনটাকেও আমার ঘর পর্যন্ত আনা যেত না। তবু সে প্রতিদিন জোর করত। বন্ধুরা আত্মীয়রা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করত আমি ভালো হয়ে উঠছি, কিন্তু ও জোর করত আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে। মনে হচ্ছিল, ওর সন্দেহ হচ্ছে আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি। আমার মনে হয় ওর বন্ধু রিজওয়ানের একটি ঘটনা ওকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। রিজওয়ানের আব্বা মারা গিয়েছিল কয়েক সপ্তাহ কোমাতে থাকার পরে, কিন্তু তাকে সবসময়ে বলা হচ্ছিল তার আব্বাকে বিছানা ছাড়তে বা কারো সঙ্গে কথা বলতে মানা করা হয়েছে। তারপর একদিন রিজওয়ান বাড়ি এল। তখন জানতে পারল সেখানে তারা মৃত্যুর চল্লিশ দিনের নিয়মমাফিক ক্রিয়াকর্মের তোড়জোড় করছে।

আমিও ওর গলা শুনতে চাইছিলাম, ওকে আশ্বস্ত করতে চাইছিলাম যে আমি এখনও বেঁচে আছি। শেষে এদিন আমি ঠিক করলাম ওর সঙ্গে কথা বলব রাতের দিক, সেই সময়টা ও ঠিক করে গিয়েছিল রিশেপসনের সহায়কদের দিয়ে। মাত্র পঞ্চাশ বা ষাট ফুট দূরত্ব আমার কাছে এত বেশি লাগছিল, এত যন্ত্রণা দিচ্ছিল, মনে হচ্ছিল যেন সবক'টা সেলাই ফেটে যাবে আর গলগল করে ভাজা রক্ত বের হবে। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছেটা এত বেশি ছিল যে আমার পা আমাকে টেনে নিয়ে এল রিশেপসনে। আমার মনে হল যেন আমি হাসপাতালের আকারের পৃথিবীর ম্যাপের ওপর দিয়ে হাঁটছি। প্রতিটি পা চলা যেন কয়েক হাজার মাইল, ইসলামাবাদ, করাচি, ফ্র্যাঙ্কফোর্ট, নিউইয়র্ক, আর একপা হলেই শিকাগো।

'আব্বু তুমি বলছ?'

'তোমার গলা অন্যরকম লাগছে কেন?'

'তোমার কি খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?'

'এবার তুমি একদম ঠিক হয়ে যাবে।'

'আব্বু আমি কি এখুনি চলে আসব?'

কান্না চেপে রাখা হল, কারণ বহুদিন লেগেছে এই প্রশ্নগুলো তৈরি করতে। আমার মনে আছে সেই রাতে আমার যথেষ্ট ব্যথা লাগছিল, তার ওপর এইসব বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে আরও বেড়ে গেল যন্ত্রণা। কেবল যে ক'মিনিট তার ব্যথাহারী গলা শুনেছি, সেই সময়টুকু সহজ ছিলাম। তবে এই দুর্বলতা, ব্যথা এবং আবেগের সঙ্কট সত্ত্বেও আমি নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাইনি, আমার পুরুষকারকে নিন্দিত হতে দিইনি।

আমি বলতে পারব না কেন তার সঙ্গে আমার বাবাকেও মনে পড়ে। হতে পারে সে বাবার খুব বন্ধু ছিল, যত মায়ের দিকের বা বাবার দিকের সব নাতিদের মধ্যে তাকেই বেশি ভালোবাসতেন। ছুটির দিনগুলোতে তাকে নিয়ে গ্রামে চলে যেতেন। আমার বাবার একটা মেয়ে গাধা ছিল, পশুদের খাবার বয়ে আনত সেটা। তার আবার একটা বাচ্চাও ছিল। বাবা তাকে সেটার পিঠের ওপর বসতে বলতেন, তখন সে বলত,

'দাদু, এর হ্যান্ডেলটা কোথায়?'

বাবা খুব মজা পেতেন, তার হাতে দড়িটা ধরিয়ে দিয়ে বলতেন, 'এই যে হ্যান্ডেল।

কিছুদিন পরে বাবা যখন আমাদের শহরের বাড়িতে এলেন, সে জিজ্ঞেস করেছিল গাধাটা কেমন আছে। বাবা বলেছিলেন গাধাটা আর তার বাচ্চাটার অসুখ করেছিল, মরে গেছে। ও খুব দুঃখিত হয়েছিল, মহল্লার সবার কাছে খবরটা বলে বেড়িয়েছিল যে তার দাদুর সব গাধাগুলো মরে গেছে। পড়শি মহিলারা তার মায়ের কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে এসেছিল, এবং জিজ্ঞেস করেছিল, আমরা কি কুমোর পরিবার, কারণ, একমাত্র কুমোররাই অনেক গাধা রাখে। সবাই তার ওপর ক্ষেপে গিয়েছিল।

তারপর যখন সে কলেজে পড়তে গেল, তখন গ্রামে এলে সে বিরক্ত হতো, মনখারাপ করত। একদিন সে তার দাদুকে বলল–

'আমি বাড়ি যাব।'

'এটাও তো তোমার বাড়ি।'

'আমি এখানে বোর হচ্ছি।'

'সেটা আবার কী জিনিস?'

আব্বা আমাদের বলেছিলেন, ততদিন পর্যন্ত তিনি জানতেন না বোর হওয়া কাকে বলে, কারণ তিনি কোনোদিন বোর হননি। কিন্তু এই ঘটনার পর তিনিও বোর হতে শুরু করেছিলেন। যখনই তিনি খুব বেশি বোর হতেন তখনই তিনি ভাড়াটা নিয়ে আমাদের শহরের বাড়িতে চলে আসতেন।

সে আমেরিকা চলে যাবার পর আমি একটা কুড়ি বছরের পুরোনো ডায়েরি পেলাম। প্রথম পাতাতে একটা জরুরি লেখা রয়েছে। আমার মনে আছে ওকে আমি একটি কালো ময়না পাখির কাল্পনিক গল্প বলেছিলাম, সেটা গান করতে পারে, অনুরোধ করলে সেই গানটা আবার গাইতে পারে। তক্ষুণি সে একটা অমন কালো ময়না পাখির বায়না ধরল, রাত দশটার সময় সে বলল তার একটা কালো ময়না চাই, পুষবে। তার বায়নাটা পাশ কাটাবার জন্যে বললাম কালো ময়না

পাখিরা শীতের সময় গরম দেশে চলে যায়। এখন শীত, গরম পড়ুক, একটা কালো ময়না তাকে এনে দেব।

সে বলল, 'আব্বু, তুমি তারপর ভুলে যাবে।' তাকে শান্ত করলাম এই বলে যে আমি কখনই তা ভুলব না, ডায়েরির প্রথম পাতায় সেটা লিখে দিলাম, 'জরুরি বিষয়, গ্রীষ্মকালে একটা কালো ময়না পাখি আমিরের জন্যে আনতে হবে।'

সে আবার বলল, আমি যেন লিখে দিই যে বিষয়টা ভুললে চলবে না। সুতরাং আমি আবার লিখলাম, 'একদম যেন ভুল না হয়।' লিখে দেবার পর সে সন্তুষ্ট হল, ঘুমোতে গেল, মনে করল আসুক গ্রীষ্মকাল, আব্বুকে তার জন্যে একটা কালো ময়না পাখি আনতেই হবে। কেননা এখন সেটা ডায়েরিতে লেখা হয়ে গেছে। কিন্তু যখন গ্রীষ্মকাল এল তখন আমি কেন সেও তা ভুলে গেছে। কেবল লেখাটা রয়ে গেছে; কি এক ক্ষমাহীন ঘটনার কথা লেখাগুলো! যখন মানুষ ভুলে যায় কিংবা শেষ হয়ে যায়, এগুলো থেকে যায়। এবং কি অদ্ভুত হৃদয়হীন দ্রুত চলে যায় সময়। এই তো মনে হয় কালকের কথা সে আমার আঙ্গুল ধরে চলত, আমাকে উপদেশ দিত, নির্দেশ দিত। সে যত সব অকিঞ্চিৎকর বস্তু এনে দিত আমাকে, খুশি হতো। এখন আমার জন্যে নিয়ে আসে দামী দামী জিনিস। আমিও আমার বাবার জন্যে আনতাম উলের পুলওভার, উলের চাদর, মনে করতাম এতে তাঁর সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে যাবে। কিন্তু এইসব জিনিস, এই সব উপহার কি দূরত্বের ক্ষত নিরাময় করতে পারে?

রাত্রি শেষ হতে চলল, ফোনটা এখনও চুপ করে আছে। আমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করলাম, নাহলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ব। কিন্তু আমার ঘুম আসছে না। কে জানে, কোন সময়ে কোন সমুদ্রের ওপর দিয়ে তার প্লেনটা উড়ে আসছে। এই ঘরটা তার কত স্মৃতি চিহ্ন নিয়ে ভর্তি হয়ে আছে।

সে যখন ছোট ছিল আমি তার ডাকনামটা সিটি বাজিয়ে ডাকতাম। সেও সিটির বাজনাটা বুঝতে পারত। আর যখন সে বাড়িতে থাকত সিটি শুনতে পেলেই পোষা জানোয়ারের মত ছুটে আসত। আমার এই অভ্যেসটা তার সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল, তারপর সে যখন ভাওয়ালপুরে মেডিক্যাল কলেজে এডমিশন নিয়ে চলে গেল, তাকে কাছে না পাবার দুঃখটা আমি এইভাবে সিটি বাজিয়ে প্রকাশ করতাম। তারপর আমি বুঝলাম যে তার মা আর বোন জেনে গেছে যে আমি কেবল সিটি বাজাচ্ছি না, তার না থাকার বেদনা প্রকাশ করছি। আমার সিটি বাজানোটা বন্ধ হয়ে গেল। মেয়েরা যেন বুঝতে না পারে আমি ভেতরে ভেতরে কত দুর্বল।

আমার মনে আছে যেদিন তার পাসপোর্টে ভিসা স্ট্যাম্প হল সেদিন সে যত খুশি হয়েছিল, আমরা তত দুঃখি হয়েছিলাম। তার মা তো কেঁদে কেটে একসা।

আমিও কেঁদেছিলাম, তবে তার মায়ের চোখ দিয়ে, নিজের চোখ শুকনো ছিল, যাতে আমি তাকে বিদায় করতে পারি সাহস আর বীরত্বের সঙ্গে। কারণ আমার বিশ্বাস ছিল যদি আমার চোখে জল আসা দেখতে পেত, সে তার সাহস হারিয়ে ফেলত, যাওয়াটাই বন্ধ করে দিত। যাবার সময় সে খুব উৎসাহিত ছিল, তার চোখে ছিল উত্তেজনা, নতুন জায়গা, নতুন স্বপ্ন। কেবল তার মা কাঁদছিল আমাদের দুজনের হয়ে।

কয়েকমাস আগে ঠিক করেছিলাম যখন সে ফোন করবে আমি তাকে জোর করব ফিরে আসতে। কিন্তু যখন সে ফোন করল ততদিন ফোনের রেট ডবল হয়ে গেছে আণবিক বিস্ফোরণের জন্যে। 'হে শত্রু, তুমি মায়েদের কাছ থেকে ছেলেদের আলাদা করে দাও, বোনেদের কাছ থেকে ভায়েদের।'

ওর মা ঘুমোচ্ছিল, আশাঙ্কা, উত্তেজনা, ভয়, স্মৃতি সব ভুলে গিয়ে ঘুমোচ্ছিল। আমি উঠলাম, একটা স্লিপিং পিল খেয়ে নিলাম, বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিলাম। আবার আমি সেই পুরোনো স্মৃতির জাবর কাটা শুরু করলাম। মনে পড়ল যখন সে ছোট ছিল আমাদের দুজনের মাঝে শুত, তার একটা হাত হয় আমার কিংবা তার মায়ের গালে পড়ে থাকত। যদি সেটাকে সরিয়ে দেয়া হতো সে উঠে পড়ত, কিংবা ঘুমের মধ্যেই আবার কারোর গালে রাখত। হয়ত সেই স্পর্শটা তার মনে সুরক্ষার অনুভূতি এনে দিত। ধীরে ধীরে আমরাও তার হাত রাখার ব্যাপারটা অভ্যাস করে নিয়েছিলাম। তারপর যখন সে বছরে দু-বছরে মাত্র কয়েকদিনের জন্যে আসত আমরা ওকে জড়িয়ে ধরতে পারতাম না, বারবার চুমু খেতে পারতাম না, সেও আমাদের মাঝে শুয়ে গালে হাত রাখতে পারত না। সে কেবল কাছে বসে কথা বলত, সেটাই আমাদের কাছে অনেক। কিন্তু এখন কোথায় হারিয়ে গেল সে, কেন ফোন করল না? তার ঈদ কি দৌড়োদৌড়ি করে কিংবা প্লেনে বসে বসেই কেটে গেল। ঈদের দিনে ঘরে পৌঁছতে না পারার দুঃখটা তার কতটা হয়েছে এইসব ভাবতে ভাবতে কখন যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, ঘুমিয়েছি না স্বপ্ন দেখেছি জানি না। আমি দেখছি সে শুয়ে আছে আমার পাশে, একটা হাত আমার গালে। আমি আমার হাতটা ওর হাতের ওপর রাখলাম। তারপর আমি তার ছোট্ট নরম হাতটা ধরে চুমু খেতে গেলাম, কিন্তু সেটা বড় হয়ে গেল, কঠিন হয়ে গেল। আমি চমকে উঠলাম। ওর মা ঘরে নেই। উত্তেজিত কথাবার্তা গোলমাল আসছে নিচ থেকে আর সে বসে আছে আমার বালিশের কাছে। আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম, তখনই সমস্ত অনুশাসনের বন্ধন ভেঙে আমার দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল।♦

সানাজ দাভুদজাদে ফার
লাক্সিমবুগ প্রবাসী ইরানি কবি

গাজী সাইফুল ইসলাম

সানাজ দাভুদজাদে ফার (sanaz davoodzadeh far) লাক্সিমবুগ প্রবাসী ইরানিয়ান কবি। লাক্সিমবুর্গ হলো বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও জার্মানি পরিবেষ্ঠিত ইউরোপের ছোট্ট একটি দেশ। ফার সেখানে একজন ফ্রিল্যান্স পেইনটার। ফার শিল্পের পথে পা রাখেন থিয়েটার ও সঙ্গীত দিয়ে। বিশেষ করে ইরানিয়ান ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীত। পারি মালকি ও মোস্তবা আসগরির মত বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীদের কাছে তালিম নিয়েছেন তিনি। অভিনয় করেছেন বহু নাটকে আর

পুরস্কারও জিতেছেন। এরপর শুরু করেন গল্প ও কবিতা লেখা। ক্লাসিক্যাল ধারায় রচিত তার কবিতা সে দেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা-সাময়িকিতে ছাপা হয়েছে, হচ্ছে। তার কবিতা ইংরেজি, আরবি, ফরাসি, স্পেনিশ, জার্মান, কুর্দিশ ও মরক্কোর ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তার প্রথম বই *আই ওয়াক অন দ্য ডেড লেটারস* আরবি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং সিরিয়ার তামোজ পাবলিশিং সেটি প্রকাশ করেছে। ফরুঘ ফারুকজাদের পদাঙ্ক অনুসারী সানাজ দাভুদজাদে একজন ফেসবুক অ্যাক্টিভিস্টও। বহু দেশ যেমন কায়রো, ওমান, ইরাক, তিউনিয়শিয়া, রোমানিয়া, তার্কি প্রভৃতি দেশের সাহিত্য সম্মেলনে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রবাসে থেকেও বিভিন্ন সময় ইরান সরকারের গণনিপীড়নমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়েছেন তিনি।

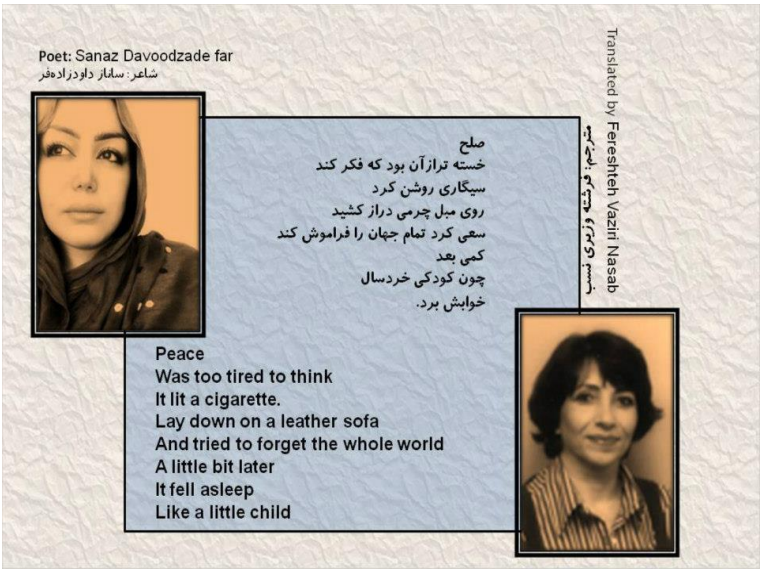

সানাজ দাভুদজাদে ফারের কবিতা

আমি হাঁটি, মৃত শব্দদের ওপর দিয়ে

এক.

আমাদের চার চোখের যখন মিলন ঘটেছিল
মাঝখানে ছিল ক'টি সিগারেটের ধোঁয়ার দেয়াল
আর আমাদের দেখা হওয়ার আগে
এককাপ গরম চায়ে ছিল একটুকরো চিনির আলোড়ন।
এ অভিজ্ঞতাই সারাজীবনের পাথেয় আমাদের।

দুই.
আমি যখন ভালোবাসতে শুরু করলাম
তোমার ভালোবাসা তখন তলানিতে
এরপরও বহু বছর দৌড়ে গেছি আমি।

তিন.
তুমি যদি খুলে দাও তোমার সীমান্ত
ভিসাটিসা ছাড়াই
তোমার মাঝে হবো স্থানান্তরিত আমি
আমার মামলা রাজনৈতিক নয়
আমি পালিয়েছি একজন প্রেমিকা হিসেবে
এখন যদি ঘরে ফিরি
ওরা সেলাই করে দেবে আমার জিহ্বা ও ঠোঁট
সীমানার বাইরে ভালোবাসা
ঘর ছাড়া, কথাবার্তা ছাড়া।

চার.
তোমার কথার বাষ্প
ভুল করে ঘিরে রেখেছে আমার কল্পনা
তাকাও আমাদের ভাগাভাগির স্বপ্নের দিকে
তাদের অবস্থান খুবই নিকটে, ন্যূনতম দূরত্বে
অথচ তোমার হাত গুটিয়ে নিয়েছ আমার থেকে,
বহুদিন আগেই।

পাঁচ.
জন্মের সময় আমি কেঁদেছি
বেঁচে থাকার সময় চীৎকার করেছি
পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার সময়
মুখে থাকে যেন মোনালিসা হাসি।

ছয়.
আমি যখন ভালোবাসার সুগন্ধির ঘ্রাণ নিই
কোনো কারখানার ভক্তই পারে না আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে

পাপড়ির মত টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলো আমায়
এরপর পাঠিয়ে দাও প্যারিসে
এরপর একটি নাম দাও 'জুলিয়েট'
তখন দেখবে আমিই হব সর্বাধিক বিক্রি হওয়া সুগন্ধি।

সাত.

একটি ভূমিকম্প যখন ধ্বসে দেয় কোনো জনপদ
আমার হৃৎপিণ্ডেও ধ্বস নামে
পৃথিবী বরাবর আমার হৃৎপিণ্ড হলো একটি দোলনা
এবং এর ভূকম্প এর সুরেলা এক সঙ্গীত আমার বেদনায়।
ওহ পৃথিবী, তুমি সুখে গাও তোমার ভুলের সঙ্গীত।
সমস্ত বিকল্প রয়েছে টেবিলটির ওপর
আঁকতে পারো একটি সকালচিত্র তোমার কথায়
দেখাতে পারো তোমার অনুপস্থিতি পাশাপাশি
হাত আর ঠোঁটের জন্য একইরকম একটি বাক্যাংশ পেতে
চুপচাপ নিরবতাকে ভরতে পারো একটি কাচপাত্রে
আর তখন আমি পান করে নেব ছায়া।

আট.

আমি একটি গুলিভরা পিস্তল
আমি যদি চোখের পলক ফেলি, গুলিগুলো তোমাকে হত্যা করবে।
যদি আমি তাদের বন্ধ না করি,
আমার সকল উপাদান আমার কাঁধে একটি পিঠব্যাগের রূপ নেবে
এবং যা ভরে উঠবে গান পাউডারে,
আমি তখন পরিণত হবো একটি বোমায়।
যদি আমি নিজেকে বিস্ফোরিত না করি, ফেটে যাব আপনিই।
এতে মনে হতে পারে যে, দুজনেই আমরা যুদ্ধ করছি মরার জন্য।
আমি হাঁটি
বুলেটগুলো ফুটে আমার চারপাশে ফুস্‌ফাস, ঠুসঠাস শব্দে।

অঙ্কন

গণিতে তার অসম্পূর্ণ উপস্থিতি
ঠোঁট ছাড়া মুখের মত

তার কালো চোখেরা কাঁদছে আমার তুলিতে
আমার চুলগুলো উড়ে গিয়ে পড়ে
তার মুখের ওপর
বাতাসের ধাক্কায় যেমনটি ঘটে সাধারণত
এরপর দৃশ্যপট থেকে উধাও হয় তার চেহারাখানি
তবু ছবিটি বিক্রি হয় ভালো।

তোমার উপস্থিতি ছাড়া

তোমার উপস্থিতি ছাড়া
আমি জমাটবাঁধা এক খণ্ড ঠাণ্ডা সিমেন্ট
শেওলা ছাড়াই শেওলাধরা
কর্তিত একটি গাছের সবুজ গুড়ি
কিন্তু এটি একটি অশুভ লক্ষণ যে,

তোমাকে ছাড়া
আমি হতে পারি না কোনো কিছু,
এমনকি
ফোটাতে পারি না একটি গোলাপও...

ফড়িং

তুমি যেমন উদ্ধৃতিযোগ্য, একটি ফড়িং
আমার বুকের বর্ণগুলোর ওপর বস, রঙ ছড়াও
এরপর উড়ে যাও অন্যত্র।
বর্ণগুলোর ওপর তোমার হাত রাখলেই
তা থেকেই ওরা গর্ভবতী হয়
ভাষাটি বংশ বৃদ্ধি করে
এবং নতুন সব বর্ণে লেখা হয় নতুন চিঠি
আর সে সব আমি পড়ি গভীর মনোনিবেশে।

মধ্যপ্রাচ্যের মায়েদের সঙ্গে

যুদ্ধ কেড়ে নিয়েছে তার ছোট্ট মেয়েটিকে
তার দু'চোখের সামনে থেকে
তার হৃদয়ের বিশাল ঔজ্জ্বল্যের মাঝখান থেকে
চুরি করেছে রঙধনু রঙের ওড়নাটি
যখন মেয়েটি তার পুতুলটিকে কোলে নিয়ে
ঘুরে বেড়াচ্ছিল বাইসাইকেলে।
একটি গোলাকার বস্তু তাকে থামিয়ে দিয়েছে
বিদ্ধ হয়ে তার গলদেশে চুরি করেছে তার হাসি।
ওহ্ আম্মু...
গভীর দুঃখে পতিত হলো সে,
তাকে বাঁচনোর চেষ্টা ছাড়াই
তার প্রাণহীন দেহের চারপাশে উড়তে লাগলো
রাজ্যের ধূলি।♦

কোভিড-১৯ এবং ভ্যাকসিন

ডা. এম এ মুমিত আজাদ পিএইচডি
(ন্যাচারাল মেডিসিন)

'ভ্যাকসিন' শব্দটি এসেছে কিন্তু ল্যাটিন শব্দ 'ভ্যাক্সা' থেকে যার অর্থ গরু। আর এ ভ্যাকসিন বা টিকা বলতে বোঝায় এমন কিছু উপাদান যা মানবদেহে কোন জীবাণু প্রবেশ করলে এর বিরুদ্ধে ইম্যুনিটি (নিরাপত্তা) সৃষ্টি করার জন্য কৃত্রিমভাবে প্রদান করা। জীবাণু থেকেই তার দ্বারা সৃষ্ট রোগের ভ্যাক্সিন প্রস্তুত করা হয়। যেকোন জীবাণুর আছে দুইটি বৈশিষ্ট্য- একটি হল রোগ সৃষ্টি করা (Pathogenecity), অন্যটি দেহের অভ্যন্তরে ঐ একই রোগের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য কিছু পদার্থ (Antibody) তৈরি করা। ভ্যাক্সিন তৈরির সময় রোগ

সৃষ্টির ক্ষমতাটিকে নষ্ট করে দেওয়া হলেও এর অন্য বৈশিষ্ট্যটি ঠিক রাখা হয়। রোগ সৃষ্টির ক্ষমতাহীন জীবাণুকেই ভ্যাক্সিন হিসেবে দেহে প্রবেশ করানো হয়। যার ফলে এই জীবাণু দেহে রোগের কারণ হয় না, বরং রোগটি যেন শরীরকে আক্রান্ত করতে পারে সেজন্য বিশেষ পদার্থ (Antibody) তৈরি করতে থাকে সেইসাথে পরবর্তীতে এই জীবাণুগুলো পুনরায় প্রবেশ করলে তা সহজে সনাক্ত করতে সক্ষম হয়।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

৪২৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক ইতিহাসবিদ থুসিডিডেস (Thucydides) লক্ষ্য করেন যে এথেন্স শহরে যেসব রোগী স্মলপক্স আক্রান্ত হবার পর বেঁচে যাচ্ছে তাদের পুনরায় আর এই রোগটি হচ্ছে না। পরবর্তীতে চীনারা সর্বপ্রথম ১০ম শতাব্দীর শুরুতে ভ্যাক্সিনেশন এর আদিরূপ ভ্যারিওলেশন (Variolation) আবিষ্কার করে। ১৭৯৬ সালে বৃটিশ চিকিৎসক ডা. এডওয়ার্ড জেনার আধুনিক ভ্যাক্সিনেশন আবিষ্কার করেন। এজন্য তাকে খেতাব দেওয়া হয় 'ফাদার অব ইম্যুনিলোজি'। তিনি পরীক্ষণে প্রমাণ করেন যে কতিপয় গোয়ালিনীদের রক্ত গরুর বসন্তে সংক্রমিত হয় এবং এর থেকেই তার একটি inoculation জেমস ফিলিপ নামে ৮ বছরের একটি সুস্থ বালকের দেহে প্রয়োগ করে পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৮৮০ সালে লুই পাস্তুর জলাতঙ্কের (Rabies) ভ্যাক্সিন আবিষ্কার করেন এবং ভ্যাক্সিন জগতে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসেন। ঐতিহাসিকভাবে এডওয়ার্ড জেনার, লুই পাস্তুর, মাউরিচ হিলিম্যান প্রমুখ বিজ্ঞানীগণকে ভ্যাকসিনেশন এর প্রবর্তক হিসাবে গণ্য করা হয়।

ভ্যাকসিনের সুবিধা

vaccine বা টিকা আমাদের শরীরের প্রাকৃতিক রোগ-প্রতিরোধ (immune system) ব্যবস্থার সাথে একসাথে কাজ করে অনেক ভয়ঙ্কর ও জীবনঘাতী রোগ-সংক্রমণের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমাদেরকে সহায়তা করে। সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আমাদের দেহে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা। যেমন আমাদের রক্তের শ্বেত রক্তকণিকা (leukocyte) আমাদের দেহের রক্ষক হিসেবে কাজ করে এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ-সংক্রমণ দমনের জন্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শ্বেত কণিকা রয়েছে মূলত তিন ধরনের- বি লিম্ফোসাইট (B-lymphocytes), টি লিম্ফোসাইট (T-lymphocytes) ও ম্যাক্রোফেজ (macrophages). মূলত ভ্যাকসিন ব্যবহারে এদের কাজের গতি বৃদ্ধি পায়। এদের মাধ্যমে শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থার মূলনীতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হল-

১. ম্যাক্রোফেজ- ম্যাক্রোফেজ আমাদের দেহের মৃত বা মৃতপ্রায় কোষ গুলো ভক্ষণের পাশাপাশি রক্তে অনুপ্রবেশকারী বিভিন্ন জীবাণুদেরকেও ধ্বংস করে এবং রক্তে অ্যান্টিজেন (antigen) নামক সেইসব বহিরাগত জীবাণুর কিছু অংশ রেখে যায়। আমাদের শরীর তখন সেইসব অ্যান্টিজেন গুলোকে ক্ষতিকর ও বিপদজনক বস্তু হিসেবে সনাক্ত করে এবং এর প্রতিরোধে আক্রমণের জন্য উদ্দীপনা যোগায়।

২. বি লিম্ফোসাইট- বি লিম্ফোসাইট থেকে উৎপন্ন হয় অ্যান্টিবডি (antibody) এবং এই অ্যান্টিবডি ম্যাক্রোফেজের ফেলে রেখে যাওয়া অ্যান্টিজেনের উপর আক্রমণ চালায় এবং দেহে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে উন্নত করে।

৩. টি লিম্ফোসাইট-টি লিম্ফোসাইট দেহের সংক্রমিত কোষগুলোর উপর আক্রমণ চালায় সেগুলোকে ধ্বংস করে। শরীর যখন প্রথমবারের মত কোনো নতুন জীবাণুর সম্মুখীন হয় তখন সেই সংক্রমণের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক কার্যকরী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কয়েক দিন থেকে সপ্তাহ পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। অতঃপর সংক্রমণের পর সেই জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রক্রিয়া আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা বা ইমিউন সিস্টেম সংরক্ষণ করে। পরবর্তীতে সেই জীবাণুটি যদি আবারও শরীরে অনুপ্রবেশ করে তবে টি লিম্ফোসাইট সাথে সাথে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং রক্তে আবারও একই ধরনের অ্যান্টিজেন উপস্থিত হলে বি লিম্ফোসাইট তার প্রতিরোধে কার্যকরী অ্যান্টিবডি তৈরি ও অবমুক্ত করে।

ভ্যাকসিনের কার্যপদ্ধতি

ভ্যাকসিন প্রয়োগে দেহে এক ধরনের কৃত্রিম সংক্রমণের সৃষ্টি করে এবং এ প্রক্রিয়ায় আমাদের শরীরের রোগ-প্রতিরোধক ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হয়। এ ধরনের সংক্রমণ দেহে কোনো ধরনের অসুস্থতার সৃষ্টি না করলেও এটি দেহে টি-লিম্ফোসাইট ও অ্যান্টিবডি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কৃত্রিম সংক্রমণের তীব্রতা কমে গেলে শরীরে থেকে যায় টি-লিম্ফোসাইট ও বি-লিম্ফোসাইট যা মনে রাখে ওই জীবাণুর বিরুদ্ধে পরবর্তীতে কিভাবে লড়াই করতে হবে। ভ্যাকসিন গ্রহণের পর শরীরে পর্যাপ্ত টি-লিম্ফোসাইট ও বি-লিম্ফোসাইট তৈরি হতে কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। এর পরই শরীর সেই জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরির জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হয়। ভ্যাক্সিনগুলোই আমাদের দেহের রোগ-প্রতিরোধক ব্যবস্থার কাছে অনুজীবটির আক্রমণ করার পূর্বেই শত্রু হিসাবে পরিচিত করায়। যার ফলে পরবর্তীতে দেহে এ ধরনের অনুজীব প্রবেশের

সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারে এবং কোন প্রকার বংশবিস্তারের সুযোগ না দিয়ে তাকে ধ্বংস করে ফলে।

বাংলাদেশে ভ্যাকসিনের বর্তমান অবস্থা

ফাইজার/বায়োএনটেক এবং মডার্না এবং অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিনগুলি বেশ কয়েকটি কঠোর জাতীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থার দ্বারা ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত হওয়ায় নিরাপদ এবং কার্যকর ভ্যাকসিনের প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হওয়া ভ্যাকসিন জগতে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। যা কোভিড-১৯ এর মহামারি নিয়ন্ত্রণে আনতে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে। আমাদের দেশে Oxford-AstraZeneca vaccine ভারতের Serum Institute of India (SII) মাধ্যমে বাংলাদেশে (ভারতীয় নাম 'কোভিশিল্ড') বিগত ২২ শে ফেব্রুয়ারি থেকে Covid-19 vaccination শুরু হয়েছে। এজন্য সর্বনিম্ন বয়স ধরা হয়েছে ৪০ বছর। বর্তমান অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, জানিয়েছেন যে, রাশিয়ান স্পুটনিক ও চীনের সিনোফার্ম বা সিনোভ্যাক্সের ভ্যাকসিন সককারিভাবে সংগ্রহের বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

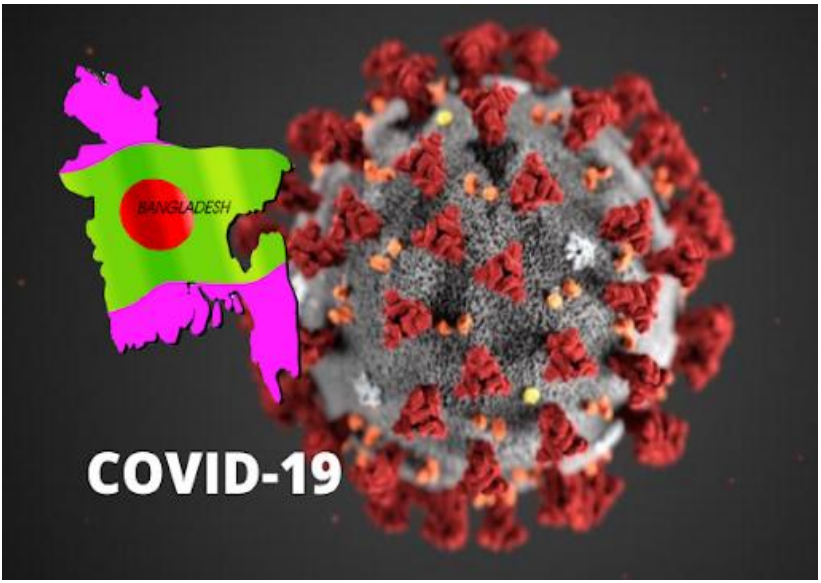

শিশু-কিশোরদের ভ্যাকসিন

শিশু-কিশোররা এখনো টিকা নেবার সুযোগ না পাওয়ায় তাদের মধ্যে করোনা ছড়িয়ে আশঙ্কা থাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছাড়পত্রের পর ইউরোপীয় ইউনিয়নও ১২ থেকে ১৫ বছর বয়সিদের জন্য চলতি মাসেই বায়োনটেক-ফাইজার কোম্পানির করোনা টিকা অনুমোদনের জন্য ইতিবাচক তথ্য দিয়েছে।

এভাবে যদি জনসংখ্যার একটা বৃহৎ অংশ ভ্যাকসিনের আওতায় আসে তাহলে রোগের বিস্তার প্রতিরোধের মাধ্যমে হার্ড ইম্যুইনিটি তথা গোষ্ঠীবদ্ধ প্রতিরোধ' সম্ভব হয়। এর ফলে যাদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তারাও রোগের কবল থেকে রক্ষা পাবে।

ভ্যাকসিনের ডোজ

বিভিন্ন যৌক্তিক কারণে অনেক ভ্যাকসিনের বা সাধারণ টিকার ক্ষেত্রেই শিশু কিংবা পূর্ণবয়স্কদের একের অধিক ডোজ এর প্রয়োজন হতে পারে। বিশেষ বিশেষ ফ্লু ভাইরাস প্রতিরোধের জন্য প্রতিবছরই এই টিকা নতুন ভাবে বানানো হয়। তবে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন ০২টি স্টেজে শরীরে দেওয়া হয়।

ভ্যাকসিনের সীমাবদ্ধতা

এক কথায় বলা যায় ভ্যাকসিন গ্রহণে দেহে উপকারিতা ছাড়া তেমন কোন ক্ষতিকার দিক নেই। তদুপরি ভ্যাকসিন নেওয়ার পর শরীরে কিছু ছোটখাটো রোগের উপসর্গ দেখা যায়। যেমন- এলার্জিক কন্ডিশন, হালকা জ্বর বা শরীরে ব্যথা অনুভব হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো অস্বাভাবিক কিছু নয় বরং টিকা প্রয়োগের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। তবে ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতার গবেষকদের নতুক করে ভাবতে হচ্ছে। ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটি, ডেটা ইভ্যালুয়েশন অ্যান্ড লার্নিং ফর ভাইরাল এপিডেমিকসের অধীনে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে উল্লেখ করেছে 'শুধুমাত্র করোনা ভাইরাস রোধক ভ্যাকসিন এলেই করোনা সংক্রমণ বন্ধ হবে না'। কোভিড-১৯-এর রূপ বদলের বা মিউটেশনের ফলে সৃষ্ট নতুন নতুন স্ট্রেন তথা মিউটেন্টের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিতে পারবে কিনা এ বিষয়ে আশংকা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। আরএনএ ভাইরাস ভ্যাকসিন আবিষ্কারের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে মিউটেশন। ভ্যাকসিন গ্রহণের পরও কিছু মানুষ দ্বিতীয়বারও আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।

পরিসমাপ্তি

ভ্যাকসিনের কাজ হলো রোগের বিরুদ্ধে দেহের প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে জোড়দার করা। তথাপি ভ্যাকসিনের সীমাবদ্ধতা থাকলেও কোভিড-১৯ এর প্রতিষেধক হিসাবে প্রাকৃতিক উপাদানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ক্লিনিক্যাল অবজারভেশন চলছে। করোনা মোকাবিলায় ভেষজ ওষুধকে ঘিরে নতুন করে সম্ভাবনা জন্ম দিয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) করোনাভাইরাস ও অন্যান্য মহামারির সম্ভাব্য চিকিৎসায় আফ্রিকান ভেষজ ওষুধ পরীক্ষার প্রোটোকল অনুমোদন দিয়েছে। জার্মানিতে একদল গবেষক দীর্ঘদিন ধরে করোনার মতো ভাইরাসের ওষুধ তৈরির চেষ্টা চালিয়ে কিছু সাফল্য পেয়েছেন বলে তারা আশা প্রকাশ করেছেন। ভাইরোলজিস্ট

ড. ক্রিস্টিন ম্যুলার উল্লেখ করেন যে, অনেক বিপদজনক ভাইরাস কাবু করতে তারা সিলভেস্ট্রল নামক এক প্রকার প্রাকৃতিক উৎস হতে এক শ্রেণির কার্যকর অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্টের সন্ধান তারা পেয়েছেন। বাংলাদেশেও ফনিমনসা নামক একটি স্থানীয় ভেষজ উদ্ভিদে কোভিড-১৯ রোগের ইতিবাচক ফলাফল পেয়েছেন। জার্মানরা এশিয়ার আগলাইয়া গোত্রের মেহেগোনি গাছ থেকে এই সিলভেস্টরল পাওয়া যায় তারা আশা করছেন যে এগুলো "ইবোলা, লাসা ও জিকার মতো মারাত্মক ভাইরাস মোকাবিলার ক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়া গিয়েছিল তা কোভিড-১৯ রোগটির বিরুদ্ধেও কার্যকর প্রতিরোধক ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদি। COVID-19 মহামারীর প্রাদুর্ভাবের শংকা নিয়ে সারা বিশ্বময় বিভিন্ন traditional (ঐতিহ্যবাহী) ভেষজ ওষুধ বা ন্যাচারাল মেডিসিন নিয়েও গবেষণা অব্যাহত রয়েছে।

পরিশেষে বলতে হয় রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে যথানিয়মে ভ্যাকসিন নেওয়া দরকার পাশা-পাশি ভ্যাকসিন গ্রহণের পরও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, হাত ধোয়া, জনসমাগমে নিয়মিত মাস্ক বা মুখোশ ব্যবহার করা হলে আপাতত প্রাথমিকভাবে সুরক্ষিত থাকা সম্ভব। তাই প্রটোকল অনুযায়ী সমস্ত সরকারী নির্দেশাবলী অনুসরণ করা জরুরী। সেইসাথে দেহের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা শক্তিকে শক্তিশালী করতে

করণীয়

১) শরীরে এন্টি-ভাইরাল প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো, ২) টিস্যু-সুরক্ষা (এবং টিস্যু মেরামতের) এবং ৩) জীবাণুর বিরুদ্ধে শক্তিশালী অ্যান্টিভাইরাল প্রভাব কাজে লাগানো। ভেষজ ওষুধ এবং প্রাকৃতিক খাবারগুলি ইম্যুইনিটি বাড়াতে বা সংক্রমণ রোধ করতে সক্ষম। বিশেষ করে একাইনেশিয়া, সিনকোনা, *কার্কুমা লংগা* এবং *কার্কুমা জ্যান্থুরাইজা*সহ বিভিন্ন ওষুধি উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত সক্রিয় উপাদান বা ভেষজ এজেন্টগুলি এর এন্টিভাইরাল এক্টিভিটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত বিধায় তা শরীরের ইমিউনোমোডুলেটরি, এন্টি-অক্সিডেন্ট এবং এন্টি-ইনফেকটিভ হিসাবে সেবন করা যেতে পারে।♦